প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

জি. এ. ই. পাবলিশার্স-এর পক্ষে সুনন্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর পক্ষে গোপাল দে কর্তৃক ২৫/১এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত এবং ইউনাইটেড এণ্টারপ্রাইজ-এর পক্ষে মানিক রায় কর্তৃক ১৩/বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে গ্রন্থিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

এ-গ্রন্থের নাম 'দুই বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় রকমারি স্থান-বিবরণ' হলে, আলোচিত বিষয়বস্তু হয়ত বেশী স্পষ্ট হত। কিন্তু মুদ্রণের বাধা ও অন্যান্য কারণে তা হয়নি। পাঠকের তাতে অবশ্য অসুবিধার কোনো কারণ নেই। আগাগোড়া বিবরণধর্মী ও সহজপাঠ্য এ-বইটি অক্লেশে পাঠ করে তিনি বিষয়বস্তু আদ্যন্ত জানবার পর, আশা করি, চমৎকৃত হবেন।

'স্থান-বিবরণ' কথাটির তাৎপর্য এক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ব্যাপক। নানা জায়গার ভূপ্রকৃতিগত বিবরণই শুধু নয়, আলোচিত ছড়াগুলিতে অসংখ্য স্থান বা অঞ্চলের খ্যাতি-অখ্যাতি, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক, কৃষিগত পরিচয় এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ বস্তু, ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী, ঘটনা প্রভৃতির অগণিত উল্লেখ আছে। আমাদের গ্রামীণ জনমানসের বিশ্বস্ত দর্পণ হিসাবে সেগুলির সমাজতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। সেজন্য এ-পুস্তক কিছু লৌকিক ছড়ার সংকলনমাত্র নয়; বাঙালির বিস্তৃততর সামাজিক ইতিহাস রচনার অন্যতম সোপানরূপেই এটি পরিকল্পিত ও লিখিত। প্রধানত সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে এটির বিচার (এবং বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার) হলে আমরা কৃতার্থ হব।

কি উপায়ে ছড়াগুলি সংগৃহীত, শ্রেণী-বিভাজিত এবং বহুক্ষেত্রে জেলাওয়ারি উপস্থিত করা হয়েছে তা গ্রন্থারম্ভেই বলেছি। (প্রসঙ্গত, দেশবিভাগের আগে পুববাংলার জেলাগুলির যেসব নাম ছিল আমরা তা-ই রেখেছি; আজকের বাংলাদেশে যে বহুসংখ্যক জেলা ও উপ-জেলার সৃষ্টি হয়েছে, বিভ্রান্তি এড়াতে, সেগুলির নামোল্লেখ করিনি)। একক প্রচেষ্টা প্রসূত বর্তমান সংকলনের অপ্রতুলতা এবং কিভাবে তা দূর হতে পারে সেকথাও লিখেছি সখেদে। তবে বিষয়টিকে গ্রন্থবদ্ধ করবার সর্বপ্রথম প্রয়াস হিসাবে, যাবতীয় পথিকৃৎস্থানীয় পুস্তকের মতোই, এখানেও প্রাথমিক অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য ছিল। আশা করব, অন্যান্য গবেষক এই সূত্রপাতে সন্তুষ্ট না থেকে, ভবিষ্যতে বিষয়টিকে সমৃদ্ধতর করবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই এইভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে থাকে।

এ-গ্রন্থের মূলবস্তু, সংক্ষিপ্ত আকারে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১ সালের মর্যাদাপূর্ণ 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌সটিটিউট

অব কালচারের সভাকক্ষে ১৯২১ সালের মে মাসে পঠিত হয়েছিল। সময়াভাবে যেসব তথ্য সেই বাঁধা-সময়ের বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি এখানে তা সংযোজিত হয়েছে এবং বইটি পুনর্লিখিত হয়েছে বহুলাংশে। এক-এক ঘণ্টাব্যাপী তিন কিস্তিতে প্রদত্ত সে-বক্তৃতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেছিলেন, যথাক্রমে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, একই বিভাগের প্রাক্তন 'রবীন্দ্র অধ্যাপক' ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং 'কলিকাতা দর্পণ' প্রণেতা শ্রী রাধারমণ মিত্র। সেই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার উচ্চ সাধুবাদের জন্য তাঁরা সকলেই এবং সুব্যবস্থার জন্য সভাকক্ষের কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন-পর্বে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি আমার অকালপ্রয়াত স্ত্রী স্বর্গীয়া উমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকুরিসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলা-গেজেটীয়ার এবং পাঁচটি জেলার পুরাকীর্তি-গ্রন্থ রচনা/সম্পাদনার সময়ে সাত-আট বছর ধ'রে প্রায় আড়াই হাজার গ্রাম-পরিক্রমাকালে তিনি অশেষ ক্লেশে আমার নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন। এ-গ্রন্থভুক্ত বহু ছড়া সরজমিনে গ্রামবৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে তাঁরই অনুলিখিত। মোট সংগ্রহের পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে বিমোহিত ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধীনে এ-বিষয়ে গবেষণার জন্য তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রীকে সাদরে বরণ করে নেন যদিও সে-সময়ে তিনি আর গবেষক একেবারেই নিচ্ছিলেন না। যে-গ্রন্থ তাঁকে শিক্ষাগত উচ্চ সম্মান এনে দিতে পারত, গভীর মনস্তাপের সঙ্গে আজ তা তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করে "স্মৃতিবেদনার মালা একলা গাঁথা" ছাড়া আমার আর কী-ই বা করবার আছে।

গ্রামপরিক্রমাকালে আর-এক নিত্যসঙ্গী ছিলেন অনুজপ্রতিম শ্রীতারাপদ সাঁতরা। ছড়া-সংগ্রহ ছাড়াও তিনি নানাভাবে এ-গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছেন। একালের প্রখ্যাত বাঙালি ছড়াকার শ্রদ্ধেয় শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅমিতাভ চৌধুরির সঙ্গে আলোচনাসূত্রেও নানা মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। পত্রযোগে অসংখ্য সংবাদদাতার মধ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমির কর্তৃপক্ষ এবং জনাব সৈয়দ মুস্তাফা আলি (স্বনামখ্যাত সৈয়দ মুজতবা আলির বড় ভাই) শীর্ষস্থানীয়।

ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময়েও অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি অগণিত অপরিচিত গ্রামবাসীর। প্রকাশন-সংস্থার তরফে আনন্দ ভট্টাচার্য, সমর নন্দী ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলেই বইটির সৌষ্ঠব ও ছাপার ভুলের স্বল্পতা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

উল্লেখ্য মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র একটি: ২৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, "অব্যবহিত পূর্বের" কথাগুলির পরে "ও পরের" শব্দ দুটি যুক্ত হবে।

কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ছড়ায় স্থান-বিবরণ	১
পরিশিষ্ট	১২৬
গ্রন্থপঞ্জী	১৩১
নির্দেশিকা	১৩২

বাঙালি, বিশেষ করে গ্রামীণ বাঙালি, যে মজ্জায় মজ্জায় কাব্যপ্রাণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার সুললিত পদাবলী-সাহিত্য, তার নানা শ্রেণীর লোকসঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক গান, ব্রতকথা, তার অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-গাথা এবং মুখে মুখে উদ্ভাবিত ও প্রচলিত অজস্র প্রবাদ ও ছড়া যেগুলি প্রায়শই পদ্যবন্ধে নিবদ্ধ। অকৃত্রিম পল্লী-মানসের সৃষ্ট এই বিশাল কবিতা-ভাণ্ডারের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আমরা স্থান-বিবরণী ছড়া বলে চিহ্নিত করেছি। অল্প কিছু ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত থাকলেও সেগুলি, পৃথকভাবে, প্রধানত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ পরিচয়বাহী যা প্রায়শই গ্রথিত হয়েছে অন্ত্যমিলযুক্ত দ্বিপদীর আকারে। এই মহামূল্য কাব্যাগারের বহু মণিমুক্তা ইতঃমধ্যে লোকস্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হলেও অবশিষ্টগুলির ব্যাপক সংগ্রহ, মুদ্রণ ও সংরক্ষণের জন্য, অদ্যাবধি কোনও প্রচেষ্টার আভাসমাত্র দেখা যায়নি। অথচ এ-ছড়াগুলি যে বাংলা সাহিত্যের (আবার বলি, সাহিত্যের) এক অতিশয় উল্লেখ্য কিন্তু অনুদ্‌ঘাটিত দিক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্থান-বিবরণী ছড়া বলতে কি বোঝায় এবং কেনই বা তা বাংলা সাহিত্যের এক অনুদ্‌ঘাটিত দিক, প্রথমেই সে-বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। গ্রাম-বাংলায় যাঁরাই কিছু ঘোরাঘুরি করেছেন তাঁরা জানেন, অজ্ঞাত পল্লীবাসী বা পল্লী-কবিদের রচিত নানান স্থানের রকমারি বিবরণসংবলিত বহু ছড়া এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। সেগুলিতে বিবিধ জনপদ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় খ্যাতি-অখ্যাতির বিবরণ, স্থানীয় আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী প্রভৃতির কীর্তিকলাপ অথবা বিশেষ বিশেষ জায়গার গৌরব, প্রশংসা, নিন্দা, কুৎসা প্রভৃতি কীর্তিত। প্রবাদের মতোই এই মৌখিক ছড়াগুলির উৎসভূমি স্থানীয় জনমানস, যার সমর্থনে সেগুলি পুষ্ট ও প্রচলিত। পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে আমরা এই বহু-বিচিত্র ছড়া-ভাণ্ডারের বিশদ শ্রেণীবিভাগ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখাব, বঙ্গসাহিত্যের এই অনুদ্‌ঘাটিত ক্ষেত্রে কত মণিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে যা দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে লোকস্মৃতি থেকে। যেগুলি এখনও বিস্মৃত হয়নি, সেগুলিকে, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বার্থে, অবিলম্বে গ্রন্থবদ্ধ করা উচিত।

সে যাই হোক, স্থান-বিবরণী ছড়া যে ঠিক কি বস্তু তা বোঝাতে আপাতত একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। আমার কয়েক বৎসরব্যাপী অনুসন্ধানকালে সেটিকে খুবই সুবিদিত ব'লে মনে হয়েছে। "আইতে শাল যাইতে শাল, তার নাম (বা তারে কয়) বরিশাল," এ-ছড়ার 'শাল' কথাটির বানান যখন তালব্য-শ সহযোগে নিষ্পন্ন হয়, তখন, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গবাসীরা, তার অর্থ করেন—বরিশাল এমন এক স্থান যেখানকার অধিবাসীরা আসতে-যেতে দু'বারই দাগা দিয়ে যান। এই তাৎপর্যে, ছড়াটি বরিশালবাসীদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষকারী ও নিন্দাসূচক। সে-অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা এখানে তা নিয়ে বিতর্ক বৃথা। বড় কথা হল, কিছু লোক, কোনও সময়ে, সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর এহেন স্বভাবের অভিজ্ঞতা হয়তো লাভ করে থাকবেন, যা থেকে মুখে মুখে ছড়াটির উদ্ভব এবং মুখে মুখেই তার প্রচলন। তাৎক্ষণিক প্রতীতিপ্রসূত কোন-কিছুতেই সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশিত হবার সম্ভাবনা কম। তবু এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ-থেকে-দেখা বরিশালবাসীর স্বরূপ এ-ছড়াটিতে ছায়াপাত করেছে। বরিশাল ভূখণ্ড সম্পর্কে সরাসরি না হলেও, সেখানকার অধিবাসীদের চরিত্রগত এক তথাকথিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি বক্র ইঙ্গিতের সুবাদে ছড়াটি, ব্যাপক অর্থে, অবশ্যই স্থান-বিবরণী ছড়ার অন্তর্গত। এ-জাতীয় নিন্দা, কুৎসা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা কৌতুককর শত শত গ্রাম্য-ছড়ার যখন বিস্তৃত আলোচনা করব, তখন সেগুলির মধ্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমানস সঠিকভাবে প্রকটিত হয়েছে কি না সে-প্রশ্নেরও আলোচনা করবার অবকাশ হবে।

আবার, 'শাল' কথাটিতে যদি দন্ত্য-স প্রযুক্ত হয়—যা অবশ্যই হতে পারে—তা হলে অর্থ দাঁড়ায়, বরিশাল এমন এক ভূভাগ যেখানে স্থান থেকে স্থানান্তরে আসতে-যেতে এক বছর করে সময় লাগে। বরিশালে যে রেলপথের নামগন্ধ নেই, বাস অথবা লঞ্চও যে হালের আমদানি, সেকথা সকলেই জানেন। আলোচ্য ছড়াটির উদ্ভব সেই যুগে হওয়া খুবই সম্ভব, যখন সে-জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে, বৈঠাবাহিত ছোট ছোট নৌকায়, এ-নদী সে-নদী, এ-খাল সে-খাল অতিক্রম করে, দীর্ঘকাল পরে গন্তব্যস্থলে পৌছতে হত। সেক্ষেত্রে, এই দ্বিতীয় অর্থে, ছড়াটি হয়তো বেশী সার্থক, কেননা সেই তাৎপর্য স্থানীয় ভূ-সংস্থানের বাস্তব পরিচয়বাহী। 'শাল' কথাটির গঠনে তালব্য-শ থাকলেও একই ব্যাখ্যা অসঙ্গত নয় যেহেতু ওই বানানে শব্দটির অপর অর্থ মর্মান্তিক দুঃখ, ক্লেশকর অভিজ্ঞতা প্রভৃতি যা স্থানীয় পর্যটনকারীদের বরাবরই ভোগ করতে হয়েছে

অল্পাধিক পরিমাণে। অতএব ছড়াটির মোট তাৎপর্য দাঁড়ায়, বরিশালে যাতায়াত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভৌগোলিক বিবরণ অথবা বিশেষ বিশেষ গ্রামের বাস্তু-সন্নিবেশ সংক্রান্ত ছড়ার সংখ্যা দুই বাংলায় কম নয়। এক-এক এলাকা বা পল্লীর ভূমিতল বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ে নানান তথ্য সেগুলিতে পরিবেশিত। পরে, যথাস্থানে, সেগুলি আলোচিত হবে।

স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত ছড়ার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই অতি-সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ভূমিকার পরে আমরা এবার, তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসতে পারি—কেন এবং কী ভাবে সেগুলি বঙ্গসাহিত্যের এক অনুদ্ঘাটিত অংশ। এ-প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমার সহায়। স্বতন্ত্রভাবে শুধু স্থান-বিবরণী ছড়ার প্রতি মনোনিবেশ না করলেও, তিনি ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি গান প্রভৃতি বিষয়ে যেসব অসামান্য আলোচনা করেছেন, তাতে সেগুলি এখন বাংলা-সাহিত্যে উচ্চ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায়-অনুরূপ লক্ষণযুক্ত, স্থান-বিবরণী ছড়াগুলির সাহিত্যমূল্য নিরূপণ অতএব শক্ত কাজ নয়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ 'মেয়েলি ছড়া' নামে পরিচিত গ্রামীণ ছড়াগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তার কিছু আগে-পরে আরও অনেক মনীষীর অভিনিবেশ এদিকে নিবদ্ধ হয়েছিল। পাদরী লঙ্‌, কর্তৃক Native Life and Feelings-এর নিদর্শনস্বরূপ সংগৃহীত যে তিন হাজার প্রবাদ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'প্রবাদমালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পায়, তাতে কিছু কিছু ছড়ার দৃষ্টান্তও ছিল, যদিও সেগুলির পৃথক স্বরূপ তখনও আবিষ্কৃত বা স্বীকৃত হয়নি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর 'Folk-tales of Bengal'-এ "আমার কথাটি ফুরলো / নটে গাছটি মুড়লো" এই খাঁটি বাংলা ছড়াটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রবাদ পর্যায়ের বাইরে গ্রামীণ ছড়ার, বিশেষত মুখে মুখে প্রচলিত ছড়াগুলির, কোন স্বতন্ত্র পুস্তক সংকলিত বা প্রকাশিত হয়নি। প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সখা' ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত 'সাথী' এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকাগুলিতে ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত কিছু শিশু-কবিতা (যা ঠিক ছড়া নয়) প্রকাশিত হয়। এই সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর কিছু শিশু-কবিতা ছড়ার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে। সেকালের দুই প্রখ্যাত ছড়াকার উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'বালক' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে

আবির্ভূত 'মুকুল' পত্রিকাটির অবদানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়; সাহিত্যিক বা লৌকিক ছড়ার আঙ্গিকে রচিত না হলেও, রবীন্দ্রনাথের কিছু শিশু-কবিতা সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছড়া ও শিশু-কবিতার এই যুগপৎ সমাদরের কালে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়ে খাঁটি লৌকিক ছড়াগুলির দিকে। তার পূর্বে অবশ্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখেরা অকৃত্রিম গ্রামীণ ছড়ার সংকলনে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ এবং এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ (বাংলা ১৩০১ সাল) থেকে নিবন্ধাকারে 'সাধনা' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতে থাকে যা, পরে, 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামের এক দীর্ঘ ও অসামান্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে। কিন্তু ছড়াগুলির নির্বাচন এবং বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত কাব্যিক। তাঁর নিজের কথাতেই—

> 'সাধনা'য় আমি যখন এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধা-ভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহার প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা-মাতামহী, আমাদের স্ত্রী-কন্যা-সহোদরাদের কোমল হৃদয়পালিত, মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।······আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিক আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

ছেলেভুলানো ছড়া বা ঘুমপাড়ানি গানের কাব্যগুণ যে রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিকে বিমোহিত করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি যখন বলেন—"আমাদের সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে," তখন সেই স্বীকৃতি, যতই পরোক্ষ হোক না কেন, আমাদের বর্তমান আলোচনার স্বপক্ষে মূল্যবান সমর্থন। খুব স্থূলভাবে বললে, স্থান-বিবরণী ছড়াগুলির সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ দ্বারা 'সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়'এর যথাসাধ্য ব্যাপক চেষ্টাই বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। স্বভাবতই, সে বিশদ প্রয়াস নানা অংশে বিভক্ত, যার ক্রমিক উন্মোচনে আমাদের অভীষ্ট ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হবে। ছেলেভুলানো ছড়া বা ঘুমপাড়ানি গানের মতো মূলত কাব্যরসভিত্তিক

না হলেও, 'সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়'-এর উপাদানস্বরূপ সেসব গ্রাম্য ছড়া যে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাব্যগুণান্বিত নয় বাস্তবগুণান্বিত, এমন উপকরণে সৃষ্ট উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শনও তো রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতেই ভূরি ভূরি। অদ্যাবধি অনধীত ব'লে, আলোচ্য ছড়াগুলির সাহিত্যমূল্য নিরূপিত না হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষায় সেগুলিকে অহল্যাজীবন যাপন করতে হবে অনিশ্চিতকাল? বিশেষত, দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া, আয়াসপ্রিয় এবং সেজন্যই গ্রামবিমুখ, আমাদের সাহিত্যসেবীরা যখন এই শারীরিক শ্রমসাধ্য গবেষণায় কখনোই মনোনিবেশ করবেন কিনা সন্দেহ—অদ্যাবধি যে করেননি তা তো প্রমাণিত সত্য—তখন মাঠেঘাটে ছড়িয়ে থাকা এসব অসংখ্য মৌখিক ছড়ার কি কোন সদ্‌গতি হবে না? 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'ময়নামতীর গান', বাউলসঙ্গীত প্রভৃতি অজস্র গ্রামীণ মণিমুক্তা একদা কিছু খাঁটি সাহিত্যসেবীর প্রযত্নে বঙ্গভাষাজননীর কোলে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য-গবেষককুল এই ক্ষেত্রানুসন্ধানভিত্তিক অন্বেষণে তাঁদের সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে আগ্রহী নন বলে বঙ্গসাহিত্যের এই মূল্যবান উপাদান কি চিরকাল অবহেলিত থাকবে? বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরকম কায়েমী অধিকারভোগের সৌভাগ্যে বঞ্চিত আমার মতো এক অভাজনের বর্তমান অক্ষম প্রয়াসে সেই অনুদ্‌ঘাটিত দিক ঈষৎ উন্মুক্ত হলে আমি কৃতার্থ হব।

স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত সব ছড়াই বাস্তবধর্মী, কাব্যরসের নামগন্ধও তাতে নেই সে-কথাই বা বলি কি করে! আমার সংগ্রহে অবশ্য বিবরণমূলক ছড়ার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু পরবর্তী গবেষকরা—যদি আদৌ কেউ সেজন্য দীর্ঘদিন গ্রামগঞ্জের ধুলোকাদা মাখতে রাজী থাকেন—তা হলে এই প্রাথমিক আহরণকে নিশ্চয়ই বহুগুণ বর্ধিত করতে পারবেন। তখন এই দৈন্য হয়তো আর থাকবে না। সে যাই হোক, আপাতত আমার সঞ্চয় থেকে দু'চারটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলেই হয়তো বোঝা যাবে, আলোচ্য ছড়াগুলি কাব্যিক গুণপনাতেও একেবারে নিঃস্ব নয়। পুব-বাংলার শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রথম উদাহরণটি ভৌগোলিক বিবরণ তথা প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কিত, কিন্তু সেটিতে অনুপ্রাস ও ধ্বনিব্যঞ্জনার প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

পুঞ্জা ম্যাঘ আঞ্জাআঞ্জি চেরাপুঞ্জীর পাড়্-অ।
কালা ম্যাঘ কাল্‌দি পড়ে সাদা ম্যাঘর ঘাড়্-অ॥

অর্থাৎ, চেরাপুঞ্জীর প্রান্তে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের জড়াজড়ি ; (সেখানে) কালো মেঘ লাফ দিয়ে সাদা মেঘের ঘাড়ে পড়ে। দ্বিতীয় উদাহরণটি এ-রাজ্যের পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমানা এবং তারও পশ্চিমের বিবিধ এলাকার নারীচরিত্রের বিবরণমূলক কিন্তু ধ্বনিমাধুর্য ও অকপট বর্ণনায় একান্তই কাব্যধর্মী—

ছিঁড়া জালে মাছ ধরে ধলভূয়্যানী।
চুন-দক্‌তায় ভুলাই রাখে চিল্‌কিগড়্যানী ।।
ঘরে ভাত নাই পান খায় ঝড়গাঁগড়্যানী।
উঁচ্‌ কপালে সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ানী ।।

অর্থাৎ, ধলভূমবাসিনীরা ছেঁড়া জালে মাছ ধরে, চিল্‌কিগড়বাসিনীরা আগন্তুককে পান-দোক্তায় ভুলিয়ে রাখে, ঝাড়গ্রামবাসিনীরা ঘরে ভাত না থাকলেও পান খায়, আর বেলেবেড়াবাসিনীরা উঁচু কপালেও সিঁদুর পরে। বেলেবেড়া গ্রামটি মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত। 'চলন্তিকা'কার 'উঁচ্‌কপালী' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও এহেন দেহলক্ষণযুক্তা নারীকে অলক্ষণা বলেছেন। ফলে, ছড়াটি বিদ্রূপাত্মকও বটে।

পরবর্তী নিদর্শনটি বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার অতি দূরবর্তী ও দুর্গম এক গ্রাম নান্দার সম্পর্কে। বরিশালের দুর্গমতা সম্পর্কে যে বাস্তবধর্মী, ভৌগোলিক শ্রেণীর ছড়াটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, এটি তার সগোত্র হলেও বাহুল্যবর্জিত বর্ণনায় কাব্যরসমণ্ডিত—

কতদূর নান্দার ?
নান্দার যেতে আন্ধার ।।

পুরুলিয়া জেলার বড়বাজার থানার অন্তর্গত এক পল্লীর প্রাণী-বিবরণ সংক্রান্ত একটি ছোট ছড়াও কাব্যরসের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল—

শালিক, চড়াই, টিয়া।
বাস বামুনদিয়া ।।

কাব্যগুণান্বিত আরও দৃষ্টান্তের আলোচনা আমরা পরে, যথাস্থানে, বিশদতর-ভাবে করব। আপাতত এই কয়েকটি উদাহরণের দৌলতেই হয়তো বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্গত সব ছড়াই বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে পারে।

প্রায় নব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন ছেলেভুলানো ছড়া ও ঘুমপাড়ানি

গানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত নানান ছড়া শুধু প্রচলিতই ছিল না, নিশ্চয়ই বেশী সংখ্যায় লোকস্মৃতিতে বিদ্যমানও ছিল। কিন্তু জনগণের সঙ্গে অপরিচয় হেতু—যেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর 'ঐকতান' কবিতায়—তিনি সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না; কেউ সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণও করেনি। করলে, যে জাতুদণ্ডের স্পর্শে বাংলা কথা-লোকসাহিত্যের দুটি শাখাকে তিনি উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তারই সঞ্জীবনীরসে আলোচ্য ছড়াগুলিও সিঞ্চিত হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য, তা হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও পরিতাপের কথা, বাংলা সাহিত্যের চর্চা যাঁদের নেশা অথবা পেশা—সংখ্যায় যাঁরা শত-সহস্র—তাঁরাও, অদ্যাবধি গ্রাম-বাংলার পথের ধুলায় লুণ্ঠিত এই অহল্যা-অভাগিনীদের দিকে দৃক্‌পাত করেননি।

সে যাই হোক, স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত ছড়ার সাহিত্য-কৌলীন্য লাভের স্বপক্ষে শেষ যুক্তি হিসাবে আমি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছেলেভুলানো ছড়া' থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি। তাঁর বিচার্য ছড়াগুলি সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

> এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির, কোনোকালে, কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

আমাদের আলোচ্য ছড়াগুলির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অত্যল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সেগুলির রচয়িতারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; তাঁদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টাও বৃথা। এ-বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট খোঁজখবর করেও, দু'চারটি ক্ষেত্র ছাড়া, আমার তন্ন তন্ন অনুসন্ধান কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হয়নি। এদিক থেকে দেখলে, আলোচ্য ছড়াগুলি বেদের মতোই অপৌরুষেয়। তবে কিছু কিছু ঐতিহাসিক-সামাজিক-বাণিজ্যিক প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক স্থান-বিবরণী ছড়ার প্রণেতা-সম্পর্কিত তথ্য জানা না গেলেও তাদের আনুমানিক উদ্ভবকাল, আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণে, নির্ণয় করা সম্ভব। এ-প্রসঙ্গটি পরে, যথাস্থানে, বিশদভাবে আলোচিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধের অন্যত্র বলেছেন—

> যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল—অবশেষে, কালক্রমে কঠিন চাপে

সেই কর্দম পদচিহ্নরেখাসমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে, কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।······অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এইসকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া একত্র করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

যেসব লক্ষণের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া এবং ঘুমপাড়ানি গানকে বাংলা সাহিত্যে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন, তার সমস্তই স্থান-বিবরণী ছড়াতেও বিদ্যমান। যথা—অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা অনির্ধারিত অতীত-কালে রচিত উভয়বিধ ছড়াই "কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে"; "অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে" এবং "আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে"। "অনেক দিনের হাসিকান্না", "অনেক হৃদয়বেদনা"—কাব্যধর্মী ছড়ার যা অন্যতম বিশিষ্ট গুণ—আমাদের আলোচ্য বিবরণ-প্রধান ছড়াগুলিতে হয়তো প্রাধান্য লাভ করেনি, কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য-গুলি সেখানে বহুক্ষেত্রেই উপস্থিত—

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীকূল ॥

ভাগীরথীতীরের একদা-প্রখ্যাত ও অত্যন্ত জনবহুল বন্দর সপ্তগ্রামের লুপ্ত গৌরবের দীর্ঘশ্বাস এ-ছড়াটিতে ধ্বনিত। প্রচণ্ড বাণিজ্যিক কর্মব্যস্ত সে-স্থানের জনারণ্য বোঝাতে ছোট ছোট চারটি শব্দ "চালে চালে বৈসে লোক" যে কতদূর

সুপ্রযুক্ত ও খাঁটি গ্রাম্য-ছড়াধর্মী তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। অনুরূপ আর একটি ছড়া—

বাহান্ন বাজার, তিপ্পান্ন গলি।
তবে জানবি, চন্দ্রকোণায় এলি॥

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, রেশম-তসর প্রভৃতির সুবৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে (যখন এখানে বিস্ময়করভাবে ইংরেজ ও ফরাসি কুঠির যুগপৎ অস্তিত্ব ছিল) চন্দ্রকোণার "প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ" এই ছড়াটিতে বিধৃত। অথবা,

গাইয়ে, বাজিয়ে, সুর।
তিনে বিষ্ণুপুর॥

কিংবা,

কাগজ, কলম, কালি।
এ তিন নিয়ে বালী॥

এ'দুটি ছড়ায় মল্ল-রাজধানী বিষ্ণুপুরের গান-বাজনার ঐতিহ্য এবং হাওড়া জেলার বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান বালী গ্রামের অতীত গরিমার রেশ এখনও শোনা যায়, যা রবীন্দ্রনাথ-কথিত "হাসিকান্না" ও "হৃদয়বেদনা"র কাছাকাছি। বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অংশে, যথাস্থানে, অনুরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হবে। সেজন্য এই প্রারম্ভিক আলোচনার শেষে এ-সিদ্ধান্তে আসাই হয়তো সঙ্গত যে, অদ্যাবধি অবহেলিত হলেও স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত আলোচ্য ছড়াগুলি বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট অঙ্গ।

বর্তমান গ্রন্থের এই উপক্রমণিকা অংশেই আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করে নেওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য ছড়াগুলি প্রায় সবই লোকমানস-প্রসূত; নাগরবৃত্তের প্রভাব সেখানে কদাচিৎ পড়েছে। তদুপরি, মুখে মুখে উদ্ভূত ও প্রচলিত ব'লে, সেগুলিতে গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে অবাধে, যা লিখিতভাবে রচিত হলে হয়তো বা কিছুটা সংযত হত। প্রশ্নটা তাই শিষ্ট ও অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ নিয়ে। সকলেই জানেন, আমাদের গ্রাম্য কথ্যভাষায় মাগী, মিন্‌সে, ভাতার, মাগ, নাঙ (উপপতি), ঢেমন (লম্পট), ঢেমনী (রক্ষিতা), ডবকা (নবযুবতী), মদ্দা, মাদী, পোয়াতি,

পীরিত, মাই, পোঁদ, গু, মুত, হাগা, মোতা প্রভৃতি অসংখ্য কথা অশিষ্ট শব্দের পর্যায়েই পড়ে না এবং গ্রামীণ শিক্ষিতসমাজেও হামেশাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু গ্রাম্য লোকের দ্বারা গ্রাম্য কথ্যভাষায় রচিত ছড়া, সেজন্য যে মৌখিক ভাষায় তাঁরা অভ্যস্ত, তারই প্রতিফলন যে সেখানে ঘটবে এটাই একান্ত স্বাভাবিক। একথা অবশ্য এখানেই বলা প্রয়োজন যে, শহুরে রুচিবোধের নিরিখে অশিষ্ট এমন শব্দ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সেসব ছড়ায় কিন্তু খুব বেশী নেই। তবু যেসব ক্ষেত্রে আছে, শহুরে মাফকাঠিতে সেগুলির বিচার ধান-ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যাওয়ার মতোই নিরর্থক ও অযৌক্তিক। (এ-উপমাটি রবীন্দ্রনাথই ব্যবহার করেছেন তাঁর অন্য এক প্রবন্ধে)। তবু, এ-প্রবন্ধের অন্যত্র এই তথাকথিত আপত্তিকর উদাহরণগুলির উল্লেখে পাছে কোন শুচিবায়ুগ্রস্ত ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, সেজন্য প্রশ্নটির নিষ্পত্তি সূচনাতেই করে নেওয়া ভালো।

কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামীণ ছড়ার ভাষায় গ্রাম্যতা থাকবে, কারও অপছন্দ হলে তিনি তা পরিহার করবেন অথবা অন্য প্রসঙ্গে যাবেন,—এই স্বতঃসিদ্ধ অভিমতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এমন এক কর্ম করে গেছেন, যাকে ইংরেজিতে বলে queering the pitch। তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে গতর, মদ্দা, মিনসে, মাগী, তেলিমাগী, কামারমাগী প্রভৃতি শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হলেও, বিশেষ একটি ছড়ার উদ্ধৃতিকালে তিনি তার একাংশ উহ্য রেখেছেন সেখানে 'ভাতার' কথাটি ছিল বলে। অথচ এই তদ্ভব শব্দটি সংস্কৃত 'ভর্তৃ' শব্দ থেকে বিশেষ বিবর্তিত না হয়ে সরাসরি এসেছে। সংক্ষেপে ছড়াটির বিবরণ—আদরিণী দুর্গার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় তার মা, বাবা, মাসী, পিসী, ভাই—যাঁরা এতদিন তাকে নানাভাবে পালন-পোষণ করেছেন—সকলেই ক্রন্দনরত। কিন্তু বোনের কান্নার ক্ষেত্রে, অসংলগ্নভাবে, এই দুটি পঙ্‌ক্তি এসে পড়েছে—"বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে / সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন ভাতারখাকী ব'লে॥" রবীন্দ্রনাথ "গাল দিয়েছেন ভাতারখাকী ব'লে" অংশটি অমুদ্রিত রেখে মন্তব্য করেছেন—

> এইখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার ব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না

হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিয়ে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম: বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে। / সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥ ....মা-বাপের পূর্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সব চেয়ে সকরুণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বকলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল —সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।"....

উদ্ধৃতিটি কিছু দীর্ঘ হবার কারণ—প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের পরম রমণীয় ভাষা, আর দ্বিতীয়ত, এক পল্লীবালিকার সকরুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রগাঢ় উপলব্ধি সত্ত্বেও, তাঁর মতে অশিষ্ট, এমন একটিমাত্র গ্রাম্য শব্দকে পরিহার করবার আগ্রহে সংস্কৃত ও বাংলায় তার রূপবিকৃতির অপচেষ্টার (আবার বলছি, অপচেষ্টার) প্রতিবাদ করা। একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার সময়ে, ঠাকুরবাড়ির মার্জিত আচার-আচরণ গোঁড়া ব্রাহ্মধর্মের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু তার পরে প্রায় ৯২ বৎসর গত হয়েছে, যে-সময়ে বাঙালির পল্লীমুখিনতা ও লোকমানসের সঙ্গে সংযোগ বেড়েছে বহুগুণ। লৌকিক বিষয়বস্তুর আলোচনায়, একেবারে অশ্লীল না হলে, গ্রাম্য-ভাষা পরিহারের কথা আজ কেউ বড় একটা ভাবে না। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। তবু নতমস্তকে তাঁর মার্জনাভিক্ষা করে বলি—স্থান-বিবরণী ছড়াগুলির নির্বাচনে আমরা তাঁর এহেন আপসবিরোধী কঠোর মানদণ্ডের অনুগামী হইনি। সেজন্য এ-গ্রন্থের

পরবর্তী অংশে অশ্লীল বা বিশেষভাবে অশিষ্ট শব্দযুক্ত ছড়া পরিত্যক্ত হলেও, যেসব কথা গ্রামীণ কথ্যভাষায় বিনা প্রত্যবায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলির স্পর্শদোষে কোনটিকে অচ্ছুত করা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই পরিবারে, একই পরিবেশে মানুষ আর-একজন যে অভিন্ন বিষয়ে লিখতে বসে কতদূর মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন এখানে তার সমান্তরাল উপমা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ছবি লেখেন যে 'ওবীন' ঠাকুর তাঁর সুবিদিত গ্রাম্য-গল্প 'ক্ষীরের পুতুল'-এর কিয়দংশ তুলনা-মূলকভাবে উদ্ধৃত করছি। পাঠক লক্ষ করবেন, সে-কাহিনী গ্রামীণ ছড়াভিত্তিক হলেও সেখানে তথাকথিত মার্জিত রুচির পিছুটান নেই, শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের দ্বিধা নেই ; মাটির কাছাকাছি যে-উপাখ্যান তা সঙ্গতিপূর্ণ অবাধ ভাষায় সমুজ্জ্বল। ষষ্ঠীঠাকরুণের প্রসাদে দিব্যচক্ষু পেয়ে—

> বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুম্‌ঝুম্‌ করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টক্‌বক্‌ হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির ধারে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়চ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য ! সেখানে কেবল ছোটাছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাটশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সর-বন, তেপান্তর মাঠ তার পরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীলে ঘোড়া

মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাপুলির দেশে পুঁটু-রানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচ্‌মেচ্‌ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ—সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে—এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্‌ পাড়ায় কোন্‌ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্তে—এক কন্তে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্তে খেলেন, আর এক কন্তে না-খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল, সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদর টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদর ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে—ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ল্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্‌ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন্‌ দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুবে

শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিন্‌সে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আমকাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল—দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল!···

(শেষে ষষ্ঠীঠাকুরুণও অদৃশ্য হলে বানর দুঃখিনী দুয়োরানীর জন্য সোনার চাঁদ ছেলেটিকে নিয়ে এল)। [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'ক্ষীরের পুতুল', ১৩৮৭, পৃ. ৭১-৭৪।]

আমার বিবেচনায় এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি অকারণে নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো অবনীন্দ্রনাথও বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার প্রায় সমস্ত স্তর স্পর্শ করে যে ছবিটি এখানে লিখেছেন, তাতে 'কাহার মিন্‌সে,' 'দাসী মাগী'র মতো তথাকথিত অশালীন শব্দ স্থান পেলেও তা তাঁর সুললিত রচনাশৈলীর সঙ্গে অবলীলায় মিশে গেছে, কোনও কষ্টকল্পিত ও রুচিপীড়িত অসঙ্গতির সৃষ্টি করেনি। লোক-সাহিত্যের যে কোনও বিভাগে, বিশেষ করে কথ্য-সম্ভারের আলোচনায়, এই সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত প্রয়োজন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলোচ্য ছড়াগুলির সংগ্রহ-পদ্ধতি সম্পর্কে দু'কথা বললে, এ গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশ শেষ হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে, আমার ক্ষেত্রানুসন্ধানের শুরুতে, চন্দ্রকোণা সম্বন্ধে সেই আশ্চর্য ছড়াটি—'বাহান্ন বাজার, তিপান্ন গলি,/ তবে জানবি চন্দ্রকোণায় এলি'—যখন প্রথম শুনি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-আমলের, কমবেশী দু'শ বছর আগেকার চন্দ্রকোণার, প্রভূত বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও কর্মব্যস্ততার কাহিনী, ভ্রূণের আকারে, ওই দুটি সামান্য ছত্রে বিধৃত ছিল। মুখে-মুখে-ফেরা এই আপাত-অকিঞ্চিৎকর ছড়াটির মধ্যে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

কতকালের এক টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ছড়ায় নিবদ্ধ এসব অতীত-কাহিনী যে উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান, তা বুঝতে দেরী হয়নি। শুধু ঐতিহাসিক কেন, আর্থিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, লোকচরিত্রগত, স্থান-গৌরব বা নিন্দাসূচক, কৃষিসম্পর্কিত, ভূপ্রকৃতিগত প্রভৃতি কত অজস্র বিষয়ে অসংখ্য ছড়া যে এখনও গ্রাম-বাংলার আকাশে-

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সংগ্রহের অপেক্ষায়, তা তখনই বুঝেছিলাম। তারপর দীর্ঘ গ্রাম-পরিক্রমাকালে, সর্বত্রই এসব ছড়ার সন্ধান করেছি ; কোথাও পেয়েছি, কোথাও পাইনি। তবে একথা বারংবার মনে হয়েছে, অনুসন্ধান আরও অনেক আগে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল যখন গ্রামবৃদ্ধেরা স্বগ্রামের প্রতি মমত্ববশত তার ঐতিহ্যের খবর রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পশ্চিমবাংলার প্রায় আড়াই হাজার গ্রামে আমি গিয়েছি। একজনের পক্ষে সেটা রেকর্ড হতে পারে, কিন্তু এ-রাজ্যে অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা যখন কমবেশী উনচল্লিশ হাজার, তখন আমার ব্যক্তিগত অন্বেষণের পরিসর যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

এই ঘাটতি দুটি উপায়ে পূরণ করা সম্ভব। বহুজনসাধ্য ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এ-রকম এক প্রকল্প, যোগ্য ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে, সরকারি স্তরে গৃহীত হতে পারে, অথবা, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, এলাকা ভাগ করে নিয়ে, যৌথভাবে এ-কাজে নামতে পারেন। অবশ্য এসব উচ্চাভিলাষ নিছক আকাশকুসুম কিনা কে জানে! তবে একথা মর্মান্তিক সত্য যে, এসব অমূল্য উপাদান ইতঃপূর্বেই অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট যা আছে তা হয়তো অচিরেই বিস্মৃত হবে। অতএব, হাতে সময় আর বেশী নেই।

সে যাই হোক, ব্যক্তিগত প্রয়াস ছাড়া আরও যেসব সূত্রে আমার সংগ্রহ সমৃদ্ধ হয়েছে এবার সে-বিষয়ে দু'কথা বলি। কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' এবং ঢাকার 'দৈনিক বাংলা' ও সাহিত্যপত্র 'বিচিত্রা'য় স্থান-বিবরণী ছড়ার সন্ধানে চারটি চিঠি প্রকাশিত হবার পর, অজস্র উত্তর পাই, যেগুলির ঝাড়াইবাছাই হলে, মোট সংগৃহীত ছড়া বেশ সন্তোষজনক সংখ্যায় এসে পৌছয়। অতঃপর, আমার অনুরোধে, ঢাকার 'বাংলা একাডেমি' তাঁদের নাতিবৃহৎ কিন্তু টীকাযুক্ত সংগ্রহটি আমাকে দান করেন, যেহেতু অজ্ঞাত কারণে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি নিয়ে তাঁরা আর অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁদের দান অবশ্য আমার বিশেষ কাজে লাগেনি যেহেতু সেগুলিতে, অনেক ক্ষেত্রে, নামোল্লেখ ছাড়া স্থানের কোনরকম বিবরণ ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুই বাংলায় সুবিদিত গ্রাম্য ছড়া— "দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে, / চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে ॥"—আমরা বিবেচনা করিনি কেননা সেখানে স্থানের উল্লেখ থাকলেও তার কোনও বিবরণ নেই। 'বাংলা একাডেমি'-প্রেরিত অনুরূপ বেশ কিছু ছড়া এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্যসাধক নয় ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সুবৃহৎ সংগ্রহকে,

আমি ঐতিহাসিক, আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়-কাব্যিক, ভূপ্রকৃতিগত, কৃষিগত, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা বস্তুবাচক, নিন্দা-বিদ্রূপ-কৌতুক-প্রশংসা-গৌরবসূচক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীতে উপস্থিত করব, কেননা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষকদের তাতে সুবিধা হবার কথা। বর্তমান পুস্তকের সীমাবদ্ধ পরিসরে আলোচ্য ছড়াসম্ভারের সমস্তই স্থান পেয়েছে একথা বলা না গেলেও সে-সম্পদের বহুলাংশ যে এখানে গ্রন্থবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে এই গুরুতর শ্রমসাধ্য বিনীত দাবি হয়তো করা যেতে পারে।

স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত লৌকিক ছড়াগুলির সর্ববৃহৎ অংশ যে নিন্দা-কুৎসা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কৌতুকপ্রসূত সেকথা সম্ভবত সকলে জানেন না। এই চমকপ্রদ তথ্য, বাঙালি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সুবিদিত একটির উপরে নতুন কোন আলোকপাত করে কিনা, সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সে-প্রশ্নের মীমাংসা করবেন। যাঁকে বাঙালির নবজন্মের প্রধান উদ্‌গাতা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না, সেই রামমোহনের পুণ্যনামও মসীলিপ্ত করে একদা যে বিদ্রূপাত্মক ছড়াটি প্রচলিত ছিল, প্রথমে সেটির উল্লেখ করে, একই শ্রেণীর অখ্যাতিসূচক অজস্র স্থান-বিবরণী ছড়ার আলোচনা আরম্ভ করা আমাদের অভিপ্রায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে উল্লিখিত ছড়াটি এই—

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ি খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল।
ওঁ তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল।
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিন কুল।।

ছড়াটিতে স্থান-বিবরণ হয়তো তেমন নেই কেননা রামমোহনের কুৎসা-রটনাই ছিল সেটির মূল উদ্দেশ্য। তবু, রামমোহনের পৈতৃক নিবাসের নাম, সেখানে সুরাই মেলের ব্রাহ্মণদের এককালীন বসতি প্রভৃতির পরোক্ষ উল্লেখ তাতে পাওয়া যায়। নিন্দাসূচক স্থান-বিবরণী ছড়ায় কিন্তু নির্বাচিত স্থানেরই অখ্যাতি করা হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রে; ব্যক্তিবিশেষ আক্রান্ত হয়েছেন কদাচিৎ।।

এখানে আর-একটি জিনিস লক্ষণীয়। উল্লিখিত ছড়াটি যে পেশাদার ছড়াকার (বা কবিয়ালের) রচিত তা ব্যবহৃত ছন্দ ও আক্রমণাত্মক শব্দগুচ্ছ থেকে

বেশ বোঝা যায়। পরে, অনুরূপ ছড়ার আরও নিদর্শন পাওয়া যাবে যা থেকে মনে করা হয়তো সঙ্গত যে, কবিয়ালরাই সেগুলির রচয়িতা। তবে অধিকাংশ ছড়াকার যে ছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। আমার সংগ্রহে অবশ্য আর-একটি অনুরূপ বিদ্রূপাত্মক ছড়া আছে যেটি জনৈক 'চকোত্তী'কে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য রচিত। সুশীল দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ, ছড়া ও চলতি কথা' গ্রন্থে সেটি ব্যবহার করেছেন।

শত শত গেল রথী।
শেওড়াতলার/ভৈরবতলার চকোত্তী ॥

শেওড়াতলা বা ভৈরবতলা নামের কোনও গ্রাম বা মৌজা পশ্চিমবাংলায় নেই। অতএব মনগড়া এ-পল্লীনাম দুটি অকিঞ্চিৎকর অর্থে অবজ্ঞাসূচক। যেমন, স্থানবিশেষের নগণ্যতা বোঝাতে আমরা 'ধাপধাড়া গোবিন্দপুর' এই কল্পিত অভিধাটি সচরাচর ব্যবহার করে থাকি এবং ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতা প্রমাণ করতে তার কাল্পনিক নাম রাখি 'হরিদাস পাল'। এসব চিত্তাকর্ষক সংজ্ঞা কি ভাবে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে তা পৃথক অনুসন্ধানের বিষয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথা এখানে বলা যায় যে, আলোচ্য ছড়াটিতে স্থান ও পাত্রের নাম নির্বাচনে অনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক মানসিকতাই কাজ করেছে। আত্মগর্বী কোনও চক্রবর্তী মহাশয়ের অপদার্থতা প্রকট করবার জন্য সৃষ্ট এই দ্বিপদীটি সুবিদিত এক বাংলা প্রবাদের (নাই বা হল স্থান-বিবরণ সংক্রান্ত) কথা মনে আনে—

হাতিঘোড়া গেল তল।
ভেড়া বলে কত জল ॥

গ্রাম-বাংলার দৃষ্টিতে নিন্দিত স্থানগুলির মধ্যে, কলকাতা ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাগুলির স্থান বরাবরই শীর্ষে। যে-কারণে একদা কলকাতার বাবু-বিবিদের ব্যঙ্গচিত্র প্রচুর পরিমাণে অঙ্কিত হয়েছে কালীঘাটের পটে, সেই একই বিরাগবশত এ-শহরের সত্যমিথ্যা নানান অপবাদ স্থান পেয়েছে এই ছড়াগুলিতে। প্রথম সুবিদিত উদাহরণটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত বলে প্রকাশ—

রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি ॥

সুশীল দে মহাশয় এ-ছড়াটির পাঠান্তর করেছেন—

রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই তাড়িয়ে কলকেতায় আছি ॥

এককালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী এই প্রাসাদপুরী সম্বন্ধে উল্লিখিত ছড়াটি, হায়! আজও মর্মান্তিক সত্য। কলকাতাবিষয়ক আর দুটি ছড়া—

মিথ্যা কথার কিবা কেতা।
আজব শহর কলকাতা ॥

এবং, মাটি, বেটি, মিথ্যে/মিছে কথা।
এ তিন নিয়ে কলকাতা ॥

দুটি ছড়াতেই কলকাতাবাসীর মিথ্যা কথা বলবার অভ্যাসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একেবারে অকারণে যে নয়, তা বলাই বাহুল্য। আর, মাটি এবং বেটি শব্দ দুটির অর্থ খুব প্রাঞ্জল না হলেও মনে হয়, এ-শহরে জমির আকাশ-ছোঁয়া দাম এবং তরুণীদের চালচলনই কটাক্ষের লক্ষ্য। গ্রাম-বাংলা থেকে সংগৃহীত প্রায়-অনুরূপ আর একটি ছড়া—

রাঁড়, ভাঁড়, মিছে কথা।
এ তিন নিয়ে কলকাতা ॥

এ-ছড়াটির উদ্ভবকালে কলকাতার 'বাবু'-সমাজে গণিকাগমন ও রক্ষিতাপোষণ যে সামাজিক মর্যাদাসূচক ছিল, সেকথা সমকালীন 'হুতোম পেঁচার নকশা', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' প্রভৃতি নানা বাংলা গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। আর ধনীর দরবারে প্রার্থীদের ভাঁড়ামি এবং সর্বশক্তিমান ইংরেজসকাশে উমেদারদের চাটুকারিতা যে কত প্রসারলাভ করেছিল সেকথা সকলেই জানেন।

কলকাতার সেই নব্য-সমাজে সব কিছুই যে ছিল সনাতন ধ্যানধারণার বিপরীত তা আর-দুটি ছড়ার বক্তব্য—

কলকাতা ব'লে কথা।
আগে বেরোয় হাত-পা, শেষে বেরোয় মাথা ॥

এখানে বিপরীত-প্রসবের উপমা প্রয়োগ করে কলকাতার উৎকট ভিন্নতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। অপরটি—

কলকাতায় ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতায় ঢপ॥

'ঢপ' কথাটির অর্থ আকারপ্রকার বা গড়ন। সেজন্য ছড়াটির মানে দাঁড়ায়, একমাত্র কলকাতার বেঢপ সমাজেই এসব বিসদৃশ ব্যাপার সম্ভব।

গ্রাম-বাংলার জনসাধারণের কাছে এখনও কালীঘাটই কলকাতার প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু সেখানকার পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রজ্ঞানের মান যে সাধারণত অতি নিম্নস্তরের সেকথা আর-একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায় পরিবেশিত হয়েছে—

কালির অক্ষর নাই কো পেটে।
চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥

কালীঘাট সম্পর্কে আর-একটি নিন্দাসূচক ছড়া—

কাক, কাঙালী, ভাট।
তিন নিয়ে কালীঘাট॥

কলকাতার পৃথক অঞ্চল বা পাড়াগুলি সম্বন্ধেও নিন্দাসূচক ছড়ার অভাব নেই। যেমন—

মশা, মাছি, ময়লা।
এ তিন নিয়ে ব্যায়লা (বেহালা)॥

খানা, খন্দ, হোগলা।
এ তিন নিয়ে বেহালা॥

গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা।
এ তিন নিয়ে সরশুনা॥

ভুঁড়ি, ভড়ং, বুলি।
তিন নিয়ে ইটিলী॥

যার নেই পুঁজিপাটা।
সে যায় বেলেঘাটা॥

সেকালে নতুন কিছু কলকারখানার পত্তনের জন্য বেলেঘা নাকি জীবিকার্জনের সুবিধা ছিল। কলকাতা সম্পর্কে আরও দুটি ছড়া—

বরানগর রসের সাগর।
এক-এক ঘরে তিন-তিন নাগর ॥

আশীর্বাদ করি মাথার কাটে।
মেগে খাও গে চেতলার হাটে ॥

শেষোক্ত ছড়াটি সুশীল দে-র 'বাংলা প্রবাদ, ছড়া ও চলতি কথা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি 'কাটে' শব্দটির অর্থ করেছেন মাথার 'তেলকিটে'তে বা তৈলমলে। অর্থাৎ তেলচিটে-মাথার অতি অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকেও এই বলে আশীর্বাদ করা বৃথা ছিল না যে, সে চেতলার হাটে গিয়ে শুধু ভিক্ষে করলেও দিন গুজরান করতে পারবে। বর্তমান কলকাতায় অনেক বড় বড় বাজারের সৃষ্টি হওয়ায় চেতলার হাটের গুরুত্ব যথেষ্ট কমে গেছে। কিন্তু সেকালের সেই ব্যস্ত ও সমৃদ্ধ বাজারে, প্রচুর টাকাকড়ির লেনদেনের কেন্দ্রে, দীনতম ভিখারীরও অন্নসংস্থান করা হয়তো সহজ ছিল। আবার ঈশ্বর গুপ্তের বিপরীত মেরুর যে-ছড়াটিতে সমকালীন কলকাতার নব্য-নারীসমাজ উপহসিত হয়েছেন, তার উল্লেখ পাই শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
এ. বি. শিখে, বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে ॥
আর কিছুদিন থাক রে ভাই
পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥

কলকাতা-প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে, দূর মৈমনসিংহের নরুনদি গ্রাম সম্পর্কে একটি ছড়ার উল্লেখ করব যা ঈশ্বর গুপ্তের 'রেতে মশা, দিনে মাছি' ছড়াটির অনুরূপ এবং হয়তো বা সেটির দ্বারা প্রভাবিত—

রাতে মশা, দিনে জোঁক।
মরে রে ভাই নরুনদির লোক ॥

কলকাতার নাগরবৃত্তের বাইরে, পুরানো দিনের নাগরিক রীতিনীতি যেসব স্থানে অল্পবিস্তর প্রসারলাভ করেছিল, তার মধ্যে ন'দে-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপ ও গুপ্তিপাড়া, শ্রীচৈতন্যদেব এবং অদ্বৈত আচার্যের স্মৃতিপূত শান্তিপুর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর এবং হালিশহর, উলা (বীরনগর) প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক ছড়া যেমন অনেক আছে তেমনি অপবাদসূচক ছড়ারও অভাব নেই। শেষের ছড়াগুলিতে নিন্দার লক্ষ্যস্থল কিন্তু প্রধানত নাগরিক জীবনের মন্দ দিকগুলি। যথা—

শান্তিপুর রসের সাগর।
এক-এক ঘরে তিন-তিন নাগর ॥

অথবা, রাঢ়ের রাঁধুনী বামুন, বজ্যিদের পৈতে।
নদীয়ার নবীন নাগর, কে পারে গো সইতে ॥

অথবা, তোমার-আমার হৃদ্যতা।
যেন শান্তিপুরের নৌকতা (লৌকিকতা) ॥

শান্তিপুরবাসীর অতিকথনের স্বভাব সম্বন্ধে একটি সুবিদিত ছড়া—

ঢাকা দিয়ে শেয়াল যায়,
পেঁড়োয় কুকুর ডাকে।
শান্তিপুরের বুড়ি বলে,
কামড়ালে মোর নাকে ॥

স্থানের ব্যবধান থাকলেও প্রায়-অনুরূপ একটি ছড়া সুশীল দে মহাশয়ের 'বাংলা প্রবাদ'-এ আছে—

কাঁকরপেতে কাক মরেছে,
কুষ্টিয়াতে হাহাকার ॥

গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর সম্পর্কে নিন্দাসূচক দুটি ছড়া—

গোয়াড়ির বাবু।
ফুলের ঘায়ে কাবু ॥

এবং, মদ, মাগী, জুয়াড়ী।
এ তিন নিয়ে গোয়াড়ি।।

'ন'দে-কালচারে' গুপ্তিপাড়ারও সবিশেষ অংশ ছিল, যেহেতু এই পণ্ডিতপ্রধান বৈষ্ণব-কেন্দ্রটির অবস্থান শান্তিপুরের ঠিক পশ্চিমে, ভাগীরথীর অপর তীরে। সে-স্থান সম্পর্কে অখ্যাতিমূলক ছড়ার নমুনা—

বাঁদর, পণ্ডিত, মদের দড়া।
এ তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।।

উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার
বাঁদর, হালিশহরের ত্যাঁদর।।

শোনা যায়, সেকালে গুপ্তিপাড়ায় নাকি বাঁদরের খুব উৎপাত ছিল। কিন্তু প্রাণীবাচক এই কথাটির ব্যঙ্গাত্মক প্রয়োগ ঘটেছে আরও একটি ছড়ায় যেটি সুশীল দে-র পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে।

গুপ্তিপাড়ার মাটি।
বাঁদর গড়ে খাঁটি।।

প্রসঙ্গত, 'তিন নিয়ে', 'এ তিন নিয়ে', 'তিনে মিলে', 'তিন লইয়া', 'এ তিন লইয়া' প্রভৃতি কথাগুলির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দু'লাইনের ছড়ায়, বহুক্ষেত্রে, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে, আলোচ্য স্থানের তিনটি প্রধান দোষ এবং/অথবা গুণের উল্লেখ করে, দ্বিতীয় লাইন এইসব বাঁধাবুলি দিয়ে শুরু হয়েছে দেখা যায়। ছড়াকারদের কাছে এ-রীতিটি এমন বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এই গঠনের ছড়া গ্রামাঞ্চলে 'তিনের ছড়া' নামে এখনও পরিচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে, দুটি বা চারটি দোষগুণের সমাহারেও ছড়া রচিত হয়েছে। কিন্তু সে রকম নিদর্শন বিরল।

ঠিক কি কারণে বলা শক্ত, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের জনপদগুলিই কিন্তু অপবাদের ভাগী হয়েছে বেশী। এমনও হতে পারে, ষোল-সতর শতকে সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধির কাল থেকে, আঠার-উনিশ শতকে, কলকাতা বাণিজ্য-নগরীর অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে, ব্যবসাবাণিজ্য তো বটেই, রাজ্য-ভাঙ্গাগড়া অবধি হয়েছে গঙ্গার পশ্চিম কূলের সপ্তগ্রাম, হুগলি, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি ঘাটিগুলিকে কেন্দ্র করে। প্রশাসন এবং কাজ-কারবারের এসব কেন্দ্রের আশেপাশেই বসতি করেছেন সমাজের শক্তিশালী সম্প্রদায়। আর, স্বার্থের

সংঘাতে, সামাজিক শক্তিধরদের মধ্যে যত খেয়োখেয়ি হয়ে থাকে, এমন অন্যত্র হয় কিনা সন্দেহ। অতএব, এ অঞ্চলে পরস্পরের প্রতি, বা তাঁদের বাসস্থানের প্রতি, বিষোদ্‌গার হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে, যেজন্য প্রতিপত্তিশালীরা খিস্তি-খেউড় লিখিয়েদের পোষণও করতেন শোনা যায়। তাঁদের রচিত ছড়া প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্যই লিখিত হত ব'লে, ঐতিহাসিক সত্য তাতে কিছু কিছু থাকলেও, ভঙ্গিটা সর্বদাই হত অতিরঞ্জিত ও আক্রমণাত্মক। আর্থনীতিক-বাণিজ্যিক-প্রশাসনিক মসনদগুলির ছায়াতলবাসী সেসব পৃষ্ঠপোষক, কলকাতার প্রতিষ্ঠার পূর্বে, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বাস করে, সেসব ছড়াকারদের ইন্ধন যুগিয়েছেন ব'লেই, সে এলাকার বহু স্থান সম্পর্কে নিন্দাসূচক ছড়ার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। রামমোহন সম্বন্ধে ছড়াটিও যে এহেন বেতনভুক্ ছড়াকারদের রচিত তাতে সন্দেহ নেই। প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য লিখিত এসব ছড়াকারের প্রশংসাসূচক ছড়াতেও অতিরঞ্জন যথেষ্ট। তবে, সামগ্রিকভাবে, এহেন প্রসাদপুষ্ট ছড়ার সংখ্যা বেশী নয়। অধিকাংশ স্থান-বিবরণী ছড়াই লোকমানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

অব্যবহিত পূর্বের অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত বহুসংখ্যক ছড়ায় গাঁজা, গুলি, সিদ্ধি, ভাঙ্, মদ, তাড়ি, 'অন্নভাজা', পচাই, পচুই, 'জঁদা' ভাত, পাগল, ভাঁড়, নষ্ট, দুষ্ট, কুঁদুল, তেড়েল, বাঁদর (রূপকার্থে), ত্যাঁদড়, ঘেঁটেল, চেটেল, ঠক, জুয়াড়ী, বদমাস, হারামজাদা, চোর, বাটপাড়, ছেঁচড়, গলাকাটা, কানা, কুটে, খোঁড়া, আমড়ার আঁটি, (রূপকার্থে), মাগী, রাঁড়, ছিনাল, ঢেমন, নাগর, দাঙ্গাবাজ, বিবাদ, কলহ, ঝগড়াঝাঁটি, লাঠালাঠি, ফাটাফাটি, মিছে কথা, মিথ্যে কথা, প্রবঞ্চনা, ভড়ং, ক্ষ্যাপা কুকুর, সোঁদরবনের বাঘ প্রভৃতি শব্দ এমন অজস্র ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে যে, সেগুলি সবক্ষেত্রেই নিছক বিদ্বেষ বা কল্পনাপ্রসূত না-ও হতে পারে। ঝাড়াইবাছাই ও উপযুক্ত বিশ্লেষণ করে সেগুলি থেকে বিভিন্ন অঞ্চলঘটিত নির্ভরযোগ্য সামাজিক তথ্য অল্পবিস্তর নিষ্কাষণ করা হয়তো সম্ভব। আশা করি, সমাজতত্ত্ববিদরা এই নতুন আহরণ-ক্ষেত্রটির কথা ভেবে দেখবেন, যা অদ্যাবধি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ব'লে মনে হয় না।

আঠার-উনিশ-বিশ শতকে কলকাতা-মধ্যমণির প্রভাবপুষ্ট যে বিরাট শহরাঞ্চল গড়ে উঠল ভাগীরথীর দুই তীর বরাবর, সেখানে আধুনিক শহুরে সভ্যতার সাবতীয় দোষগুণ—গুণের থেকে দোষের অংশই হয়তো বেশী—দ্রুত ফুটে উঠতে লাগল সমাজজীবনে। সনাতন পরিবেশপুষ্ট সেকালের ছড়াকারেরা এই উৎকট পরিবর্তনকে সুনজরে দেখলেন না। ফলে, গঙ্গাতীরবর্তী ২৪-পরগণা ও হাওড়া

জেলার নানা এলাকা সম্বন্ধেও নিন্দা-কুৎসা-বিদ্রূপাত্মক ছড়ার ছড়াছড়ি। প্রথমে পশ্চিম তীরের হাওড়া শহরসমেত স্থানগুলির কথাই বলি—

মশা, মাছি, মাউড়া (হিন্দীভাষী)।
এ তিন নিয়ে হাওড়া॥

পাগল, কুকুর, পুকুর।
তিন নিয়ে শিবপুর॥

গাঁজা, গুলি, সিদ্ধি।
তিনে শিবপুরের বৃদ্ধি॥

গাঁজা, গুলি, খেলুড়ে।
তিন আছে বেলুড়ে॥

গুমগড়ের (উদয়নারায়ণপুর থানা) ঠক।
এক কই মাছে তিন টক॥

চোর, চোট্টা, ছ্যাঁচড়া।
তিন নিয়ে ব্যাঁটরা॥

গাঁজা, ভাঙ/গুলি, কলকে।
এ তিন নিয়ে শালকে॥

দুলে, কাপালী, মুচুরজান।
এ তিন নিয়ে বাগনান॥

বাগনান ঠিক ভাগীরথীতীরবর্তী নয়, অনেকটা পশ্চিমে অবস্থিত।

ফলের ওঁছা নোনা।
দেশের ওঁছা কোণা॥

নষ্ট, দুষ্ট, কুঁদুল।
তিন নিয়ে আঁদুল॥

আরও উত্তরে, হুগলি জেলার অন্তর্গত কয়েকটি স্থান সম্পর্কে অনুরূপ ছড়ার দৃষ্টান্ত—

পেটে ভাত নেই, মুখে বুলি।
তবে জানবি জেলা হুগলি॥

গাঁজা, গুলি, মদের ছড়া।
এ তিন নিয়ে ওতোরপাড়া॥

ওতোরপাড়া—ধনের ঘড়া।
বালী—হাড় কালি॥

পেয়েছি কোঁদলের গোড়া।
আর যাব না ওতোরপাড়া॥

[কোঁদলের তথাকথিত পীঠস্থান উত্তরপাড়া সম্পর্কে এ-ছড়ার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটি সূক্ষ্ম ও সুন্দর।]

লাগন, ভাঙন, ঝগড়াঝাঁটি।
এ তিন নিয়ে বরিজহাটি॥

(বরিজহাটি হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বিখ্যাত জনপদ জনাই-এর নিকটবর্তী ধনীপ্রধান গ্রাম)। অদূরের মহানাদে শিবের বার্ষিক উৎসবের ('জাত') সময় প্রচণ্ড ভিড়ে যে কিছু অশালীন কাণ্ড ঘটে থাকে তা আর-একটি ছড়ার বিষয়বস্তু—

মানাদের (মহানাদের) জাত।
কে দেয় কার পোঁদে হাত॥

গাঁজা, গুলি, সিদ্ধিখোর।
এ তিন নিয়ে কোন্নগর॥

উড়ে, মেড়ো, হিজড়ে।
এ তিন নিয়ে রিষড়ে॥

গাঁজা, গুলি, ছিঁচ্‌কে চোর।
এ তিন নিয়ে কোন্নগর॥

গুলিখোরের কিবা ঢঙ।
দেখতে যেন চুঁচড়োর সঙ॥

গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙা।
এ তিন নিয়ে ফরাসডাঙা॥

'অন্নভাঙা' কথাটির অর্থ ভাত পচিয়ে (বা disintegrate করিয়ে) প্রস্তুত মদ। বিদেশী সুরার একদা-প্রখ্যাত কেন্দ্র ফরাসডাঙায় (নামান্তরে, চন্দননগরে) পচাই বা ধেনো মদেরও যে সমাদর থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি! পরবর্তী ছড়াটি আলোচ্য এলাকার সবচেয়ে উত্তরের জনপদ হুগলি সম্পর্কে—

মদ, মাগী, গুগলি।
এ তিন নিয়ে হুগলি॥

একদা চাকুরিসূত্রে দীর্ঘকাল হুগলিতে বসবাসকালে সেখানে গুগলির প্রাচুর্যের কথা শুনিনি। সেজন্য এ-দ্বিপদীটিতে শুধু অন্ত্য-মিলের প্রয়োজনে ভোজ্যবস্তুটির নামোল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

এবার ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী বৃহত্তর কলকাতার কয়েকটি লোকালয় সম্পর্কে নিন্দাসূচক ছড়ার উল্লেখ করি। হাওড়া-হুগলি জেলার ছড়াগুলির মতোই দক্ষিণ থেকে উত্তরে অগ্রসর হলে, প্রথম গ্রাম বাওয়ালি (থানা বজবজ, জেলা ২৪-পরগণা)। সেখানকার জমিদার মণ্ডল-পরিবারের দানধ্যান, ধর্মকর্ম এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠায় একদা খুব সুনাম ছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট দেবালয় আজও তাঁদের নিজ গ্রামে এবং চেতলার বসতবাটির কাছে বিদ্যমান। কিন্তু কুৎসাকারী ছড়াটির বয়ান—

যদি এলি বাওয়ালি।
সব বুদ্ধি খোয়ালি॥

জীবিকাসূত্রে ২৪-পরগণায় অবস্থানকালে ও পশ্চিমবাংলার মন্দিরাদির বিস্তৃত অনুসন্ধানের সময় মণ্ডল-পরিবারের সঙ্গে বাওয়ালি ও চেতলায় কয়েকবার যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল। তাঁরা এতদূর সজ্জন ও লোকবৎসল যে, বাওয়ালির সমাজ বলতে প্রধানত তাঁদেরই বোঝায়। তবু এহেন অহেতুক ছড়ার উৎপত্তি, সমাজপতিদের নিয়ে কটূক্তি-কণ্ডূয়নের বাঙালিসুলভ বৈশিষ্ট্যটির (যে-কথা রামমোহনের ক্ষেত্রে আগেই বলেছি) ইঙ্গিতবাহী।

ভাগীরথীর পুব তীরে, কলকাতা-পরিমণ্ডলের মধ্যে, আর-তিনটি স্থান সম্পর্কে অনুরূপ ছড়া—

মশা, মাছি, নর্দমা।
এ তিন নিয়ে দমদমা॥

ঝগড়া, বিবাদ, কলহ।
এ তিন নিয়ে খড়দহ॥

কাজের বেলায় আমড়ার আঁটি।
বাড়ি কোথা? না, পানিহাটি॥

কলকাতা-পরিমণ্ডলের বাইরে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আর্থনীতিক প্রভৃতি প্রভেদ হেতু, যে নিন্দাসূচক ছড়ার প্রচলন বিশেষ কম এমন নয়। দূরবর্তী জেলাগুলির বহু স্থান সম্বন্ধেও এরূপ ছড়ার খুব অভাব নেই। তবে, লক্ষণীয়ভাবে, দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ও কুমিল্লা জেলা সম্পর্কিত ছড়া আমাদের সংগ্রহে আসেনি বললেই চলে। সংগ্রহ-পদ্ধতির অপর্যাপ্ততাই তার কারণ। কেননা গোটা উত্তরবঙ্গের অধিবাসীরা বাঙালির চিরাচরিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক স্বভাব থেকে মুক্ত একথা বিশ্বাস করা শক্ত। আশা করি, আমার একক প্রচেষ্টার পরিপূরণকল্পে ভাবীকালের গবেষকরা এ-ঘাটতি দূর করবেন। পদ্মার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি বিষয়ে আমরা এ-শ্রেণীর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব জেলাওয়ারিভাবে যাতে সেগুলির উৎসভূমি নির্ণয় করা সহজ হয়। সেজন্য বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-পুরুলিয়া (মানভূম)-বাঁকুড়া-বর্ধমান-নদীয়া-হুগলি-মেদিনীপুর-২৪-পরগণা এই জেলাগত ক্রমটি অনুসৃত হবে। পূববাংলার জেলাগুলি আসবে তার পরে কেননা সেখানকার কথ্যভাষার সবিশেষ পার্থক্য হেতু সংশ্লিষ্ট ছড়াগুলি পৃথকভাবে আলোচিত হওয়াই সমীচীন। প্রথমে বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানের অখ্যাতিসূচক কয়েকটি ছড়া—

হাড়ি, মুচি, বাউড়ি।
তিন নিয়ে সিউড়ি॥

পাকপাড়া লক্ষ্মীছাড়া।
ঘরে ঘরে মদের হাঁড়া॥

পাকপাড়া নলহাটিসন্নিহিত এক গ্রাম। পরবর্তী ছড়াটিতে সংলগ্ন অন্য জেলায়

অবস্থিত অদূরবর্তী একটি জনপদের উল্লেখ থাকলেও বাকি তিনটি এ-জেলায় বলে সেটি এখানেই উল্লিখিত হল—

গগনপুরের ধুলো। (মুরারই থানা)
পারকান্দীর মুলো। (রামপুরহাট থানা)
পাইকড়ের বঁটি। (মুরারই থানা)
বংশবাটির বেটি। (সুতী থানা : মুর্শিদাবাদ)
ধরে ধরে কাটি ॥

পরবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদের কয়েকটি ছড়ার দৃষ্টান্ত—

হাঁস, বাঁশ, নেড়ে।
মুর্শিদাবাদ জুড়ে ॥

ঠগ, বদমাস, হারামজাদ।
তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥

চোর, চোট্টা, হারামজাদ।
এ তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥

(সুশীল দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ, ছড়া ও চলতি কথা' গ্রন্থে শেষের ছড়াটি ব্যবহার করেছেন)। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পর্কিত আর-একটি ছড়া—

গাঁজা, গুলি, ক্ষ্যাপা কুকুর।
এ তিন নিয়ে জয়কৃষ্ণপুর ॥

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এই নামের মোট ৩০টি গ্রাম আছে। তার মধ্যে কোন্‌টি যে এ-ছড়ায় উদ্দিষ্ট তা নির্ণয় করা যায়নি বলে আমরা কান্দী থানার অন্তর্গত সর্ববৃহৎটিকে (বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৮ হাজার) লক্ষ্যস্থল হিসাবে অনুমান করেছি। একই থানার রসড়া জনপদ সম্পর্কে একটি দ্বিপদী—

রসড়া গ্রামখানি রসের সাগর।
মেয়েতে মোড়লি করে, পুরুষ বাঁদর ॥

অনুরূপ একটি নারীবিদ্বেষী ছড়া এ-জেলায় অন্যতম থানা-সদর বেলডাঙার মেয়েদের সম্বন্ধে শোনা যায়—

বেলডাঙ্গার বেটি,
কথায় পরিপাটি।
কাজের নাইকো খোঁজ,
হাতনাড়াতেই ভোজ॥

বর্তমান পুরুলিয়া জেলা সাবেক মানভূমেরই অংশ। সেজন্য এ দুই ভূভাগকে একত্র করে দেখানো হয়েছে। সেখানকার কিছু ছড়ার নিদর্শন—

মুখে পান, হাতে চুন।
তবে জানবি মানভূম॥

টাঙ্গি, তলোয়ার, বর্শা।
তিন নিয়ে আর্শা॥ (অন্যতম থানা-সদর)

চালে কাঁকড় দেখে কাতর?
মানভূমের দুধেও পাথর॥

পেট মোটা, গলা সরু।
তবে জানবি পুরুলিয়ার গরু॥

'ছট্', খরা, কুষ্ঠ।
পুরুলিয়ার বৈশিষ্ট্য॥

চোর, ছিনাল (গণিকা), কুকুর।
তিন নিয়ে জয়পুর॥ (অন্যতম থানা-সদর)

কুষ্ঠরোগকবলিত বাঁকুড়ার ছড়াগুলিও কিছু সত্য ও কিছু বিদ্বেষমিশ্রিত—

কানা, কুটে (কুষ্ঠরোগগ্রস্ত), খোঁড়া।
তিন নিয়ে বাঁকুড়া॥

গুলি, খিলি, মতিচুর (তামাক)।
এ তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর॥

কাক, কাঁকড়, কাঁটানটে।
তিন নিয়ে কাকটে॥ (কাকটিয়া : পাত্রসায়ের থানা)

মুখে বুলি, খাতায় বাকি।
বাড়ি তার সোনামুখী॥

মদ, মাংস, কুঁকড়া (মোরগ)।
তিন নিয়ে বাঁকুড়া ॥

কাজে কম ভোজনে ভারী।
বাস তার ঠাকুরবাড়ি ॥ (রাইপুর থানা)

ঘরে ঘরে ভাত জঁদা (পচানো)।
তবে জানবি এলি ওঁদা ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

পুরুষ ভাল, মেয়ে খাঁদা।
দেখবি যদি আয় ওঁদা ॥

বর্ধমানের ছড়াগুলি সংখ্যায় বেশী, বৈচিত্র্যেও বিশিষ্ট—

মশা, মাছি, মুসলমান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান ॥

গাঁজা, গুলি, মদে চুর।
মীরহাট, বল্লিপুর ॥ (কালনার কাছে দুটি গ্রাম)

শুকনো গাল, দাঁতে মিসি।
বাড়ি তার কুড়মুন-পলাশী ॥

দাঁতে মিসি, কাপড় বাসি।
বাড়ি কোথা ? না, কুড়মুন-পলাশী ॥

বর্ধমান থানার অন্তর্গত এ দুটি সংলগ্ন গ্রামের প্রথমটি বিখ্যাত শৈবতীর্থ ও দ্বিতীয়টি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র পিতৃভূমি।

দত্তপাড়া মদের হাঁড়া।
কুলীনগ্রাম লক্ষ্মীছাড়া ॥

কুলীনগ্রাম শ্রীচৈতন্য-পারিষদ যবন হরিদাসখ্যাত দরিদ্র পল্লী, অতএব লক্ষ্মীর কৃপাবঞ্চিত, আর অদূরের লোকালয় দত্তপাড়ায় ছিল বহু ধনী বণিকের বাস।

লাঠালাঠি, ফাটাফাটি।
এই নিয়ে হাসনহাটি ॥ (কালনার কাছের গ্রাম)

দাঙ্গা, হাঙ্গামা, মহামারী।
এ তিন নিয়ে মেমারি ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

তাস, পাশা, দাঙ্গাবাজ।
এ তিন নিয়ে আমদাবাদ॥ (কালনার নিকটে)

তরকারিতে দেয় না নুন।
বাড়ি কোথা? না, আমারুণ॥ (ভাতার থানা)

খোস, পাঁচড়া, অম্লশূল।
এ তিন নিয়ে সিয়ারসুল॥

রাণীগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিরাট গ্রাম সিয়ারসোলের ব্যাধির তালিকাটি অভিনব, কেননা অখ্যাতিকীর্তনে এরকম দোষের ফিরিস্তি অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না।

কড়্ঢের তঁ্যাদড়। (বীরভূমের সিউড়ি থানার কড়িধ্যা গ্রাম)
আউসগাঁয়ের বাঁদর। (বর্ধমানের অন্যতম থানা-সদর)
গুস্‌করার ঢেমন (লম্পট)। ঐ
দারাপুরের বামন॥ (বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানায়)

নদীয়ার নিন্দাসূচক কিছু ছড়া আগেই উল্লিখিত হয়েছে। আর-কয়েকটি—

পোল, পাগল, পুলো।
তিন নিয়ে উলো॥ (পোশাকী নাম বীরনগর; রাণাঘাট থানায়)

অস্যার্থ, উলোয় বাগান, পাগল ও খড়ের প্রাধান্য। আর-একটি ছড়া—

খাটো কোঁচা, কাছা ঢিলা।
বাড়ি কোথা? না, ন'দে জিলা॥

বাঁশ, বাকস (বাসক গাছ), ডোবা।
তিন ন'দের শোভা॥

কাঙাল, বাঙাল, খঞ্জে (খই)।
তিন নিয়ে ন'গ্গে॥

ইট, খোলা, টালি।
তিনে হাঁসখালি॥ (অন্যতম থানা-সদর)

যার নেই পুঁজিপাট ॥
সে থাকে রাণাঘাট ॥

যার নেই চালচুলো।
সে যায় পারকুলো ॥ (নাকাশিপাড়া থানা)

হুগলির অপবাদসূচক সব ছড়ার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সেজন্য এখানে আর সংযোজনের অবকাশ নেই। হাওড়া জেলার ক্ষেত্রে একটি ছড়া উল্লেখ্য—

ঘেঁটেল (ঘোঁটকারী), চেটেল (কুতার্কিক), ফ'ড়ে।
তিনে উলুবেড়ে ॥ (মহকুমা-সদর)

মেদিনীপুর সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ছড়া উল্লেখযোগ্য—

'রে', 'বে', শালা।
তিনে মেদিনীপুর জেলা ॥

এটি স্থানীয় কথ্যভাষায় অশালীন সম্বোধনের প্রাচুর্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ—

পা গোদা, মাথা হেঁড়ে।
তার বাড়ি ফুলগেড়ে ॥

মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানায় এ-নামের ছ'টি গ্রামের কোন্‌টি যে লক্ষ্যস্থল তা অনির্নীত।

যার ওঠে পয়সার জ্বালা।
সে যায় ক্ষিরীশতলা ॥ (তমলুক কোর্টের অবস্থানস্থল)

কুঁজড়া, কাওরারী, হুর।
তিনে মেদিনীপুর ॥

সুশীল দে মহাশয় এ-ছড়াটি তাঁর গ্রন্থভুক্ত করে ব্যাখ্যায় বলেছেন—প্রথমটি কলহপ্রিয় ফলমূল বিক্রেতা, দ্বিতীয়টি 'কেওড়া' নামের নীচু জাত এবং তৃতীয়টি (সম্ভবত) শ্মশ্রুধারী মুসলমান।

গরু, গুরু, কৈবর্ত।
এ তিন মেদিনীপুরের শর্ত ॥

কিছু ভালো, কিছু খল।
দুয়ে মিলে মহিষাদল॥ (অন্যতম থানা-সদর)

চোর, ছেঁচড়, গলাকাটা।
এ তিন নিয়ে সুতাহাটা॥ (অন্যতম থানা-সদর)

বাঁশ, বাদুড়, ভূত।
তিন নিয়ে ক্ষেপুত।

ঘাটাল থানায় অবস্থিত এ-পল্লীতে এসব উপদ্রব কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু যে-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই তা হল, এই অজ্ঞ পাড়াগাঁ মহাবিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পিতৃভূমি।

২৪-পরগণার একটি ছড়ায় স্ত্রীকুলে বিশেষ সুবিধাভোগী এক গোষ্ঠীর প্রতাপের কথা বলা হয়েছে—

দোজবরের মাগ।
সোঁদরবনের বাঘ॥

আর-একটি ছড়ায় বজবজ থানার অন্তর্গত চড়িয়াল (কথ্যভাষায় 'চ'ড়েল') গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি কটূক্তি বর্ষিত—

চোর, বাটপার, তেড়েল (একরোখা)।
এ তিন নিয়ে চ'ড়েল॥

'বন্দেরঘাট' (ডায়মণ্ড হারবারের কথ্য অপভ্রংশ) ও মথুরাপুর থানার পাণ্ডববর্জিত স্থান ভাসা সম্পর্কে আর-দুটি ছড়া—

যত আছে মামলাবাজ।
তারা যায় বন্দেরঘাট॥

দক্ষিণ-পশ্চিম ২৪-পরগণার বিরাট এলাকায় শুধু ডায়মণ্ড হারবারেই কোর্ট-কাছাড়ি আছে।

যার নাই আশা।
সে যায় ভাসা॥

এবার পূর্ববাংলার ছড়ার ক্ষেত্রে আমরা ঢাকা-রাজশাহী-মৈমনসিং-পাবনা-

ফরিদপুর-বরিশাল-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-শ্রীহট্ট (সিলেট)—এই ক্রমটি অনুসরণ করব। প্রথমে ঢাকা। সেখানে কোথায় কি পাওয়া যায় সে-বিষয়ে একটি ঈষৎ নিন্দাত্মক ছড়া—

বিক্রমপুরে যোগ্য মিলে কলমপেষা চমৎকার।
গঙ্গামণ্ডলে মুইট্যা (মুটে) মিলে, নারাণগঞ্জ সাক্ষী তার।
উত্তরে ভাণ্ডারী, বেহারা, দক্ষিণ দেশে মজুমদার॥

বিক্রমপুর পরগণার মালখানগর সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া—

অপে (ভ্রমক্রমে) গেছিলাম মালখানগর।
ভাত নাই তার কোথায় ডাঙ্গর (পাত্র)॥

ঢাকা শহর সম্পর্কে দুটি ছড়া—

বেহায়া, বেইমান, বাঁকা/শাঁখা।
তিন লইয়া ঢাকা॥

মশা, মোল্লা, শাঁখা।
তিন লইয়া ঢাকা॥

পূর্ব-বিক্রমপুরের পানামবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাব ('ইষ্টি') রাখা নাকি ক্ষতিকর। এ-বিষয়ে দুটি ছড়া—

যে করে পানাম-ইষ্টি।
তার লাগে শনির দৃষ্টি॥

যে যায় পানাম।
তার থাকে না আনাম (পরের সঙ্গে সম্প্রীতি)॥

কোন কোন ছড়ায় ঢাকাই শাড়ির উল্লেখ থাকলেও বিদ্রূপের লক্ষ্য কিন্তু কিছু বেআক্কেলে লোক, ওই গৌরবসূচক পণ্যটি নয়। যথা,

নেই ঘর, নেই বাড়ি।
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥

অথবা,

মায়ের গলায় দিয়া দড়ি।
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥

আমার সংগ্রহে রাজশাহী সম্বন্ধে প্রথম ছড়াটি দুই কাছাকাছি গ্রামের নিরুত্তাপ সামাজিক সম্পর্কঘটিত—

সাঁকোয়ার কুটুম, বরিঠার ভাই।
আসাযাওয়া আছে, খাওয়াদাওয়া নাই॥

দ্বিতীয়টি ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে সংগৃহীত এবং সরাসরি কুৎসামূলক—

মদ, মাগী, বাদশাহী।
এই তিনে রাজশাহী॥

রাজশাহীতে কস্মিন্‌কালে কোনও বাদশাহ ছিলেন না, তবে সেরকম চালচলনস্পর্ধী জমিদার থেকেও থাকতে পারেন।

মৈমনসিং সম্বন্ধে নীচের ছড়াটির প্রথমাংশে নিন্দা দ্ব্যর্থহীন হলেও শেষাংশ সম্ভবত সেখানকার আরণ্য-প্রকৃতির সূচক—

চোর, চোট্টা, মইষের শিং।
এই তিন লইয়া মৈমনসিং॥

সে-জেলার বিধিব্যবস্থাহীন জয়নশাহী পরগণা সম্বন্ধে একটি তিক্ত ছড়া—

হিসাব নাই, তজবিজ (তদারক) নাই।
সে পরগণা জয়নশাই॥

মৈমনসিং-এর কূটকচালখ্যাত শেরপুর (স্থানীয় উচ্চারণে 'শ্যারপুর') সম্পর্কে সাবধানবাণী—

যে না জানে ফ্যারফুর (মারপেঁচ)।
সে জানি না যায় শ্যারপুর॥

গরিব, পাগল ও মামলাবাজের কল্পিত বাসস্থান পাবনা সম্পর্কে কয়েকটি ভালো ছড়া—

পাবনা।
সদাই ভাতের ভাবনা॥

পাগল গেছে পাবনা।
কিসের তবে ভাবনা॥ (হয়তো স্থানীয় উন্মাদালয়ের কারণে)

তুমি কি, আমি কি ?
পাগলা আর পাগলি।

তোমার-আমার ঠিকানা ?
হেমায়েতপুর, পাবনা ॥

মামলা করি পাবনায় ।
নাই কোনও ভাবনাই ॥

ফরিদপুরের খেজুরগুড়ের সুখ্যাতি নীচের ছড়াটিতে হীন কুৎসার সঙ্গে মিশ্রিত ॥

চোর, চোট্টা, খেজুরগুড় ।
এ তিন লইয়া ফরিদপুর ॥

ফরিদপুরের পাশের জেলা যশোহর। পশ্চবঙ্গে সেখানকার কোনও ছড়া সংগৃহীত না হলেও "ভূষণোর বাঙাল" প্রবাদটির উল্লেখ করা যেতে পারে যার অর্থ অজ-পাড়াগেঁয়ে। যশোহরের অন্তর্গত এবং অন্যতম বারোভূঁইয়া মুকুন্দরামের বাসস্থল সে-স্থানের অধিবাসীদের নাকি এ-দুর্নাম ছিল।

অঢেল বালাম চাল, কথায় কথায় খুন-জখম-ডাকাতি এবং অজস্র নদী-নালাসংকুল বরিশাল সম্বন্ধে প্রথম ছড়াটি—

ধান, খুন (পাঠান্তরে ডাকাত), খাল ।
তিনে বরিশাল ॥

এ-ছড়ার 'ধান' ও 'খাল' যথাযথ। কিন্তু খুন/ডাকাত বিষয়ে একটু টীকা প্রয়োজন। বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশের জেলাওয়ারি প্রশাসনিক কাঠামো এবং নানা তথ্যসমেত এক-একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশের রীতি ছিল যেগুলিকে বলা হত Annual Services Reports। (এখনকার পার্টি-রাজত্বে গদি-দখলের মুখ্য লক্ষ্যে এহেন বস্তাপচা খবরের প্রয়োজন না থাকায় শুনেছি, সেসব মূল্যবান প্রকাশনের পাট বহুকাল চুকে গেছে)। কিন্তু পুরানো রিপোর্টগুলি থেকে দেখছি, আয়তনে ২৪-পরগণা, মৈমনসিং, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা থেকে ছোট হলেও বরিশালের জেলা ও দায়রা-জজকে (District & Sessions Judge-কে) সাধারণত সাহায্য করতেন ৭/৮ জন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা-জজ যেখানে অবশিষ্ট অধিকাংশ জেলার ক্ষেত্রে (উল্লিখিত বড় জেলাগুলি সমেত) সে-রকম সাহায্যকারীর সংখ্যা কদাচিৎ হত একজনের বেশী। বরিশালে খুন, ডাকাতি প্রভৃতি দায়রা-বিচারযোগ্য গুরুতর ফৌজদারী অপরাধের পরিমাণ এসব সরকারি নথি থেকেই প্রমাণিত। (বর্তমান অবস্থা অবশ্য আমার

অজ্ঞাত)। বরিশালবাসীর এই অপরাধপ্রবণতার জন্যই হয়তো দ্বিতীয় ছড়াটির উৎপত্তি।

আইতে শাল, যাইতে শাল।
তার নাম বরিশাল॥

অর্থাৎ, সে-জেলাবাসীরা আসবার এবং যাবার সময়, দু'বারই দাগা দিয়ে যায়। আগেই এ-ছড়াটির যথার্থ ব্যাখ্যা করেছি ব'লে (পৃ. ১-২ দ্র.) এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নোয়াখালি সম্বন্ধে নিন্দাসূচক একটি ছড়াই পেয়েছি—

মুনশী, মৌলবী, ভিক্ষার ঝুলি।
এ তিন লইয়া নোয়াখালি॥

সে-জেলায় ভিখারীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত না হলে শেষের অপবাদটি অসূয়া-প্রসূত হওয়াই সম্ভব।

চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত এই পর্যায়ের ছড়ার সংখ্যা দুই। সে-জেলার কুতুবদিয়া শুঁটকি-মাছের বিখ্যাত বিক্রয়কেন্দ্র। সেখানে পান কিনতে যাওয়ার নির্বুদ্ধিতা নীচের ছড়াটিতে প্রতিফলিত।

বুদ্ধি নাই, ব্যাটার বিয়া।
পান কিনতে গ্যাছে কুতুবদিয়া॥

অপর ছড়াটি চট্টগ্রামবাসীর দুরদৃষ্ট সম্পর্কে—

উদূখলে খুদ নাই।
চাটগেঁয়ে বরাত॥

ত্রিপুরার প্রথম ছড়াটি নিন্দাসূচক নয়, সেখানকার বন্ধ্যা অঞ্চলের করুণ বিবরণ মাত্র—

আগে পুড়া পাছে পুড়া।
তার নাম ত্রিপুরা॥

দ্বিতীয় ছড়াটি অবশ্যই অখ্যাতিমূলক। যেমন—

ঠগ দুলালী, মুখপুড়া রেঙ্গা।
কুড়ুল্যার লোকের লাগে নয় শ ঠেঙা॥

অস্যার্থ, দুলালী নামের গ্রামে ঠকের বাস, রেঙ্গার লোক মুখপোড়া আর

কুড়ুয়ার দুর্দান্ত অধিবাসীদের শায়েস্তা করতে নয় শ লাঠিয়ালের প্রয়োজন হয়। তৃতীয় ছড়াটিতে, অপেক্ষাকৃত সংযত ভাষায়, দুটি স্থানের পল্লীবাসিনীদের মুখরতা ও প্রসাধনপ্রিয়তা নিন্দিত হয়েছে—

বিষ্ণাকুটের চোপা।
বুড়িচুংয়ের খোঁপা॥

উলো-ন'দে-শান্তিপুর-গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানের নারীকুলের অনুরূপ দুর্বলতা সম্পর্কে যে-ছড়াটি, কয়েকটি পাঠান্তরসহ, আগে আলোচিত হয়েছে, বহুদূরের ত্রিপুরার এ-ছড়াটি তার সহধর্মী।

আমরা ইচ্ছা করেই শ্রীহট্ট (সিলেট) সম্পর্কিত ছড়াগুলি কুৎসা-পর্যায়ের একেবারে শেষে পেশ করছি সেগুলির প্রাচুর্য ও ব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের জন্য, অন্যান্য জেলা থেকে যার পার্থক্য লক্ষণীয়। এগুলির সংগ্রহ, কথ্য-উচ্চারণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বহু শ্রীহট্টবাসীর মতো পত্রযোগে প্রচুর সাহায্য করেছেন স্বনামধন্য সৈয়দ মুজতবা আলির বড় ভাই সৈয়দ মুস্তাফা আলি। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বহু উচ্চ সরকারি পদ অলংকৃত করে সে-সময়ে ঢাকায় অবসরজীবন যাপন করছিলেন। আর এক 'সিলেটী বাঙাল', দৈনিক 'যুগান্তর'-এর বার্তা-অধিকর্তা বন্ধুবর শ্রীঅমিতাভ চৌধুরির প্রভূত সহায়তাও এ-প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। এবার ছড়াগুলিতে আসি।

বারো ঘর পীর, চৌদ্দ ঘর চুর (চোর)।
বসত করইন (করে), নাম শ্রীপুর॥

অর্থাৎ, শ্রীপুর গ্রামে কিছু সজ্জন থাকলেও অধিকাংশই দুর্জন।

তাজপুর, আবাঙ্গী মধ্য দিয়া জুড়ি (খাল)।
দিনে করইন (করে) বাবুগিরি, রাতে করইন চুরি॥

অন্তার্থ, এক খালের দুই তীরবর্তী তাজপুর ও আবাঙ্গী গ্রামের লোকেরা দিনে বাবুগিরি এবং (সে-খরচ পোষাতে) রাতে চুরি করে।
বুধপাশা পল্লীর ছেলেদের মায়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতার দুর্নাম আছে—

মায়ে করে না পুতের আশা।
তার নাম বুধপাশা॥

নারীঘটিত দুটি ছড়ার প্রথমটি—

পান, পানি, নারী।
তিন লইয়া জৈন্তাপুরী ॥

স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষকারী এ-ছড়াটিতে 'পানি' বলতে পচাই বা rice-beer বোঝানো হয়েছে, নির্দোষ পানীয় জল নয়। দ্বিতীয়টিতে গুমগুমিয়া ও পাঙ্গারাই গ্রামের কামিনীকুলের অপকীর্তি বর্ণিত।

গুমগুমিয়া, পাঙ্গারাই।
এগু (একজন) বেটীর নগু (নয়জন) হাই (উপপতি)।
রাইত পুয়াইলে এগু নাই ॥

পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে, একই অপবাদসূচক দুটি ছড়া ইতঃপূর্বে শান্তিপুর ও বরানগর সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। যথা,

শান্তিপুর (বা বরানগর) রসের সাগর।
এক-এক ঘরে তিন-তিন নাগর ॥

পার্থক্য যা, তা সিলেটের ক্ষেত্রে অবৈধ প্রণয়ীর সংখ্যা তিনগুণ।
অপেক্ষাকৃত নিরীহ আর দুটি ছড়া—

যাও যদি আগনা।
মশায় খায় মাগনা ॥

যবে গ্যালাম বালাউট।
আলু খাইয়া ভাঙলাম ঠুঁট (ঠোঁট) ॥

বালাউটের আলু নাকি অত্যধিক শক্ত। পাঠক লক্ষ করবেন, কোনও স্থানের নিন্দা করতে এহেন বিষয় বা বস্তু নেই যা কাজে লাগানো হয়নি। এখানে তুচ্ছ আলু তার দৃষ্টান্ত।

সিলেট সংক্রান্ত আরও কয়েকটি ছড়া কুৎসা পর্যায়ে পড়ে না। সেগুলি পরে, যথাস্থানে, আলোচিত হবে।

লোকজনের পরিধেয়ের ধরন ও সাধ্যাতীত চালচলনকে কটাক্ষ করেও বেশ কিছু ছড়া প্রচলিত। লক্ষণীয়, সেগুলির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান সম্পর্কে যেখানে নবাগত ইওরোপীয় সভ্যতার মোহ স্থানীয় পশ্চাৎপদ

জনসমাজকে মাত্রাতিরিক্ত বাবুয়ানি বা বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। পূর্ববাংলায় সে-সভ্যতার বিলম্বিত বিস্তারে অনুরূপ বাড়াবাড়ি ঘটেছে অপেক্ষাকৃত কম। এই শ্রেণীর ছড়ার জেলাওয়ারি ফিরিস্তিতে প্রথমে বর্ধমানের তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

লম্বা কোঁচা, কাছায় টান।
বাড়ি জানবি বর্ধমান॥

কাছা উঁচু, কোঁচা টান।
তার বাড়ি বর্ধমান॥

যদি দেখি ঢিল।
মারি দুই কিল॥

যদি দেখি টান।
বাড়ি বর্ধমান॥

হুগলি জেলা থেকে অনুরূপ বক্রোক্তিমূলক একটি ছড়া—

পেটে ভাত নাই, মুখে বুলি।
তবে জানবি, জেলা হুগলি॥

মুর্শিদাবাদ থেকে আহৃত ছড়া তিনটি।

জেমোকান্দী মহাস্থান।
পেটে ভাত নাই, মুখে পান॥

প্রসঙ্গত, কান্দী শহরসংলগ্ন এ-পাড়াটিতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পৈতৃক নিবাস ছিল। তবুও এই তির্যক ছড়া। অন্য দুটি প্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ করে প্রায়-অনুরূপ দ্বিতীয় ছড়াটি—

অজান, পাঁচথুপী মহাস্থান।
পেটে ভাত নাই, মুখে পান॥

তৃতীয় ছড়াটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন, কেননা সেটিতে কিছু মেকি সুরুচিবান (prudish) লোকের মতে একটি অশ্লীল শব্দ আছে। সূত্রাকারে প্রকাশিত এই অতি-সংক্ষিপ্ত দ্বিপদীটি গ্রামীণ ছড়ার আদর্শস্বরূপ—

পোঁদে মাছি।
জঙ্গান যেছি (যাচ্ছি)॥

পাড়াগাঁয়ের কথ্য-ছড়ায় এহেন তথাকথিত অশিষ্ট শব্দ-ব্যবহারের অনিবার্যতার স্বপক্ষে আমরা ইতঃপূর্বে জোরালো ওকালতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও সমালোচনা করেছি। এ-বিষয়ে আমাদের মতামত খুব দৃঢ়। এ-গ্রন্থে সত্যিকারের অশ্লীল শব্দযুক্ত ছড়া সযত্নে পরিহার করা হয়েছে যদিও আমাদের সংগ্রহে সেরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু গ্রামীণ কথ্যভাষায় যেসব ছড়া মুখে মুখে ফেরে, তাদের আলোচনায় নেমে কিছু তথাকথিত অশিষ্ট শব্দের সাক্ষাতে, শহুরে নাক-উঁচু বাবুদের মতো আঁতকে ওঠা ব্যাপারটাকেই আমরা রুচিবিকার বলে মনে করি, বিশেষ করে যাঁদের দ্বারা সেসব ছড়া সৃষ্ট ও সমাদৃত তাঁরা যখন সেসব কথায় অশ্লীলতা তো দূরস্থান, লেশমাত্র অশিষ্টতাও দেখেন না। উল্লিখিত ছড়াটির মর্মার্থ, যে-নিঃস্বের নিতম্ব আবৃত করবার সংস্থানও নেই, তার পক্ষে মুর্শিদাবাদের এককালীন অতি-সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী গ্রাম জঙ্গান-এ যাবার বাসনা চূড়ান্ত স্পর্ধারই শামিল। "বামন হয়ে চাঁদে হাত" এই সুবিদিত বাংলা প্রবাদের যা বক্তব্য, এ-ছড়াটিরও তাই। সে-অঞ্চলের লোক একই তাৎপর্যে বহুদিন যাবৎ ছড়াটির ব্যবহার করে আসছেন। উচ্চ-কোটির সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন যখন মাটির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায় না, কিংবা পৌঁছালেও দুর্বোধ্য ঠেকে, তখন নীচুতলাবাসীরা তাঁদের অভ্যস্ত ভাষায় এরকম বিকল্প ছড়া সৃষ্টি করে কাজ চালিয়ে নেন। তাঁদের এই স্বাধীনতা হরণের অধিকার কিছু শহুরে শুচিবায়ুগ্রস্তের আছে বলে মনে করি না। তা ছাড়া, কি নগর কি গ্রামের শিক্ষিতজনের মুখেও 'পোঁদ' শব্দটি এতই বহুলব্যবহৃত যে, বহুক্ষেত্রে তার অর্থ করা হয় পিছে বা পিছনে। যেমন, অমুক অমুকের পোঁদে পোঁদে (পিছনে পিছনে) ঘুরছে। অতএব, গ্রাম্য ছড়ার আলোচনায় এ-কথাটিকে অচ্ছুৎ বিবেচনা করবার কোনই কারণ নেই। অনুরূপ আর-সব শব্দের ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রযোজ্য।

এই বর্গে মেদিনীপুর থেকে পাওয়া ছড়াটি স্বতঃবোধ্য—

খায়দায়, দেয় না দাম।
বাড়ি কোথা? না, নন্দীগ্রাম॥ (অন্যতম থানা-সদর)

২৪-পরগণার ছড়াটিও শ্লেষাত্মক—

কালে কালে কলিকালে আরও কত হবে।
ছুঁচোর মনে সাধ হয়েছে গঙ্গাসাগর যাবে॥

'ছুঁচো' কথাটা যখন কোনও ব্যক্তিকে বিশেষিত করতে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ দাঁড়ায় ইতর শ্রেণীর তুচ্ছ জীব। অধুনা যোগাযোগ-ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হলেও, অতীতে প্রবল শীতের মধ্যে হাঁটাপথে বা নৌকাযোগে গঙ্গাসাগরে যাতায়াত ও সেখানে সমুদ্রবেলায় খোলা আকাশের নীচে দু'একদিন অবস্থান যে প্রচণ্ডরকম আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্য, "সব তীর্থ বারবার/গঙ্গাসাগর একবার" এই পুরাতন প্রবচনটি এখনও প্রচলিত। অতএব ছড়াটির মর্মার্থ হল, নিতান্ত অসমর্থ কারও পক্ষে সাধ্যের অতীত সাধ না করাই ভালো।

আর-এক শ্রেণীর ছড়ায় দস্যু-অধ্যুষিত স্থানের বিবরণ বা সে-সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই পর্যায়ের ছড়াগুলির জেলাওয়ারি উল্লেখ করতে গিয়ে দেখেছি, সংশ্লিষ্ট স্থানগুলির সংখ্যা বর্ধমান জেলায় সর্বাধিক। অন্যান্য জেলা সম্পর্কে অধিকতর ছড়া সংগৃহীত হলে ভালো হত। হয়নি যে-communication gap-এর জন্য তার কথা, অন্য প্রসঙ্গে, আগেই বলেছি। আচার্য যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা'য় বলেছেন—

> ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর পরে হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দৃশ্য যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন।...কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসনপদ্ধতি অস্ত গিয়াছে অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।...

সেই নৈরাজ্যের সময়ে আলোচ্য ছড়াগুলির কোন-কোনটি হয়তো রচিত হয়ে থাকতে পারে। আবার তার আগে বা পরে আঞ্চলিক শাসনহীনতার সূত্রে, এসব ছড়ার উৎপত্তিও অসম্ভব নয়। অমীমাংসিত উদ্ভবকালের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে এবার বরঞ্চ ছড়াগুলির উল্লেখ ও আলোচনায় আসা যাক।

এই বর্গে বর্ধমান জেলার ছড়াগুলি নিম্নরূপ—

যদি যাবি কর্জনা।
তো নেয়েধুয়ে ঘর যা না॥

অর্থাৎ, বর্ধমান-কাটোয়া সড়কসন্নিহিত, ভাতার থানার অন্তর্গত এই দস্যু-অধ্যুষিত গ্রামে যাবার দুঃসাহস না দেখিয়ে স্নানাদি সেরে নিজের ঘরে ফিরে যাওয়াই

শ্রেয়। কর্জনার অদূরের পল্লী নর্‌জা সম্বন্ধে ছড়াটিতে দৈবক্রমে ঠেঙাড়ের কবল থেকে পরিত্রাণের স্বস্তি বর্ণিত হয়েছে।

যদি পেরুলি নর্‌জা।
তো নেয়েধুয়ে ঘর যা॥

ভাতার থানার আর-তিনটি জনপদ, বলগনা, ভাটাকুল ও রসুই সম্পর্কে ছড়াগুলি নিম্নরূপ—

যদি পেরুলি বলগনা।
তো নেয়েধুয়ে ঘর যা না॥

যদি না পেরুলি বলগনা।
তো লেপ চাপা দে' ঘুম যা না॥

কালো কাপড়, মাথায় চুল।
বাড়ি কোথা ? না, ভাটাকুল॥

ফাঁসি যাই তো রসুই যাই না॥

বর্ধমানের একটিমাত্র থানা ভাতার-এর বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে, ছয়-ছয়টি ছড়া থেকে এই সমাজতাত্ত্বিক অনুমান সঙ্গত যে, সেকালে ওই এলাকা খুবই দস্যু-উপদ্রুত ছিল। গল্‌সি থানার অনুরূপ বিপদসংকুল চান্না গ্রাম সম্বন্ধে আর-একটি ছড়া—

গেলি যদি চান্না।
তো ঘরে উঠল কান্না॥

বর্ধমানের সংলগ্ন-উত্তরের জেলা বীরভূম থেকে এই বর্গের দুটি ছড়া পাওয়া গেছে—

চাঁদপাড়া না ফাঁদপাড়া। (রামপুরহাট থানায়)
দেখেশুনে পা বাড়া॥

যার নাই মাগ-ছেলে।
সে যায় দর্পশীলে॥ (বোলপুর থানায়)

দ্বিতীয় ছড়াটির অর্থ, কেবল স্ত্রীপুত্রহীন ব্যক্তিরাই দর্পশীলায় ডাকাতের মুখোমুখি হবার হঠকারিতা দেখাতে পারে। প্রসঙ্গত, এ-নামের তিনটি গ্রাম আছে পশ্চিমবাংলায়ঃ বীরভূমের বোলপুর এবং মেদিনীপুরের বিনপুর ও জামবনী থানায় একটি করে। আমাদের সংবাদদাতা তাঁর চিঠিতে প্রথম পল্লীটিকেই অকুস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ-রাজ্যের পশ্চিম প্রত্যন্তসীমায় অবস্থিত, উপযুক্ত যোগাযোগব্যবস্থাহীন শেষের দুটি পল্লীর যে কোন একটির ক্ষেত্রে ছড়াটি হয়তো বেশী প্রযোজ্য।

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানায় অবস্থিত তারাজুলি সম্পর্কে একটি অনুরূপ ছড়া এখানে উল্লেখ্য—

যদি পেরুলি তারাজুলি।
তবে বুঝবি ঘরকে এলি ॥

মুর্শিদাবাদ থেকে আহৃত দুটি ছড়ার প্রথমটি শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (ওরফে 'দাদাঠাকুর') কর্তৃক রচিত, একথা তাঁর ছেলে পত্রযোগে জানিয়েছেন। সেজন্য অন্যান্য বহু ছড়ার তুলনায় এটি অর্বাচীন। ছড়াটির বয়ান—

সাগরদিঘি-পোপাড়া।
দেখেশুনে পা বাড়া ॥

পোপাড়া গ্রামটি সাগরদিঘি থানায় অবস্থিত হবার সুবাদে সে-দুটি স্থান-নাম একত্র করে বলা হয়। যেমন, ন'দে-শান্তিপুর, গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি। অপর ছড়াটি—

না দেখে চালাই হেঁসো।
গোকর্ণে কে কার মেসো ॥

জনশ্রুতি, কান্দী থানার অন্তর্গত সমৃদ্ধ গ্রাম গোকর্ণের এক দস্যু নাকি অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে হেঁসোর (কাস্তেজাতীয় ধারালো অস্ত্র) আঘাতে নিজের পথচারী মেসোকে খুন করেছিল। ২৪-পরগণার মীনাখাঁ থানার কুমারজোল গ্রাম সম্পর্কে নীচের ছড়াটিতে দস্যু-ভীতি না ব্যাঘ্র-ভীতি আশংকার কারণ তা স্পষ্ট নয়। সে-পল্লীটি এখন অবশ্য সুন্দরবনের বাঘের এলাকা থেকে অনেক উত্তরে। কিন্তু দূর অতীতে এ দ্বিপদীটির উদ্ভবকালে, সে-জনপদ হয়তো সুন্দরবনের মধ্যেই বা কাছাকাছি ছিল। সেজন্য—

যে যায় কুমারজোল।
সে ছাড়ে মায়ের কোল ॥

এ-ছড়ায় নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি ডাকাতের হাতে নিহত হয়, না বাঘের পেটে যায়, তা ঠিক বোঝা যায় না। তখন হয়তো দুটোই সম্ভব ছিল। কিন্তু অধুনা খাস-সুন্দরবন অনেক দক্ষিণে সরে যাওয়ায় কুমারজোলে ব্যাঘ্র-ভীতি আর নেই বললেই চলে।

পুববাংলা থেকে আহৃত এ-শ্রেণীর একটিমাত্র ছড়া শ্রীহট্টের (সিলেটের), ধর্মপাশা গ্রাম সম্পর্কে—

যার না আছে পুতের আশা।
সে যেন যায় ধর্মপাশা ॥

অর্থাৎ, ধর্মপাশায় ডাকাতের হাতে পুত্রের নিধন নিশ্চিত। দস্যু-উপক্রত উল্লিখিত স্থানগুলির অধিকাংশই যে একদা রাঢ়-অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল, সে-বিষয়টি, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অখ্যাতির ধার ঘেঁষে আর-এক শ্রেণীর ছড়া আছে আঞ্চলিক খাদ্যাসক্তি বিষয়ে। সেগুলি প্রধানত বিবরণমূলক, তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে অসূয়াও কিছু আছে। যেমন, 'ইচা'র (গল্‌দা-চিংড়ির) মুড়া, 'কাউঠ্যা'র (কাছিমের) মাংস, চিতল মাছের 'কোল' (পেটি), 'চুকা ডাইল' (টক ডাল) প্রভৃতি পূর্ববঙ্গবাসীর এবং লাউচিংড়ি, ঝিঙে-পোস্ত, আদা-মৌরি ফোড়ন-দেওয়া বিউলির (কলাইয়ের) ডাল, বাটি-চচ্চড়ি প্রভৃতি যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অতি-প্রিয় খাদ্য সেকথা ছড়ায় উল্লিখিত হলে তা বিবরণমাত্র, সরাসরি নিন্দাসূচক নয়। কিন্তু এ-জাতীয় নানা দ্বিপদীতে কিছু বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকায়, আমরা সেগুলিকে সমষ্টিগতভাবে ব্যঙ্গাত্মক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছি। যেমন বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি স্বতঃবোধ্য ছড়া—

আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী।
মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥

মুড়ি খায় হাঁড়ি হাঁড়ি।
তবে জানবি বাঁকড়োয় বাড়ি ॥

হাতে লঙ্কা, মুড়ির রাশি।
তবে জানবি বাঁকড়োবাসী ॥

মুড়ি, পোস্ত, কুকড়ার (মোরগের) লড়াই।
এই তিন নিয়ে বাঁকড়োর বড়াই॥

পোস্ত-পোড়া, বিউলির ঝোল।
তবে জানবি বাঁকিসোল॥ (পাত্রসায়ের থানায়)

বীরভূম সম্পর্কে অনুরূপ কয়েকটি ছড়া যেগুলিরও ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন—

পুঁই, পোস্ত, কলাইয়ের ডাল।
এই তিনে বীরভূমের চাল॥

লাউ, পোস্ত, কচুর (পাঠান্তরে, 'লবানে'র অর্থ নবান্নের) ধুম।
তবে জানবি বীরভূম॥

খায় পোস্ত, মারে ঘুম।
বাড়ি কোথা? না, বীরভূম॥

প্রিয় খাদ্যবস্তুর উল্লেখহীন কিন্তু কর্মবিমুখ লোকের খাদ্যাসক্তির নিন্দাসূচক আর একটি ছড়া—

কাজে কম, ভোজনে ভারী।
বাস তার ঠাকুরবাড়ি॥

এই নামের দুটি গ্রাম আছে পশ্চিমবঙ্গে: বাঁকুড়ার রাইপুর ও পশ্চিম দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানায়। এদের মধ্যে কোন্‌টি যে এ-ছড়ায় উদ্দিষ্ট সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তবে প্রথমটি হওয়াই বেশী সম্ভব। পুববাংলা থেকে শুধু নীচের ছড়াটিই পেয়েছি—

ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশালবাসী।
লঙ্কা, মরিচে সদাভিলাষী॥

এটি খাঁটি গ্রাম্য ছড়া কিনা সন্দেহ। 'সদাভিলাষী'র মতো সন্ধি-সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহারের বিদ্যা বা প্রয়োজন কোনটাই গ্রামীণ ছড়াকারদের ছিল না; হাতের কাছের অজস্র কথ্য ও দেশী কথা দিয়ে তাঁরা ভালোভাবেই কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। সে যাই হোক, আঞ্চলিক খাদ্যপ্রীতি সম্বন্ধে মাত্র তিনটি জেলা থেকে সামান্য এ-কয়েকটি ছড়া সংগৃহীত হওয়াটা পরিতাপের বিষয়। প্রায়শ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এসব ছড়ায় তথ্যগত ভুলভ্রান্তি বড় একটা থাকে না। সেজন্য

সামাজিক আচরণের একটি দিকের প্রবণতা সম্পর্কে সেগুলি নির্ভুল দলিল। বাঙালির জীবনচর্চা নিয়ে যখন সত্যিকারের গভীর ও বিস্তৃত গবেষণা হবে তখন এসব ছড়ার হয়তো ডাক পড়বে আরও বহুসংখ্যায়।

এখন একই বর্গের আর-একটি শ্রেণীর উল্লেখ করব যার বিষয়বস্তু নারীসুলভ কিছু দুর্বলতা। স্বৈরিণীদের সম্পর্কে তীব্র কুৎসাপূর্ণ যেসব ছড়া আগে উল্লিখিত হয়েছে এগুলি তার থেকে অনেক মৃদু এবং কোথাও কোথাও বা কৌতুকাশ্রিত। সহৃদয় পাঠিকারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন, বাঙালি তথা সর্বদেশীয়া স্ত্রীগণের প্রসাধনপ্রিয়তা, গহনাপ্রীতি, কুলশীলগর্ব, কিঞ্চিৎ মুখরতা প্রভৃতি দৌর্বল্য তাঁদের প্রায় স্বভাবগত বললে হয়তো খুব অত্যুক্তি করা হয় না। আলোচ্য ছড়াগুলি এ-সকল বিচ্যুতিঘটিত। এ-বিষয়টিকে অবশ্য অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়। একালের কলকাতাভিত্তিক শহুরে সভ্যতার উন্মেষের আগে, সেকালের বাঙালির নাগরিক সংস্কৃতি কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর-নবদ্বীপ-গুপ্তিপাড়া-অগ্রদ্বীপ-উলা প্রভৃতি অগ্রসর জনপদগুলিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। ফলে, সেই ভূভাগের নারীসমাজ হয়তো বা অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চলের অবলাদের তুলনায় কিছুটা সংস্কারপন্থী হিসেবে বিবেচিত হতেন। সে-প্রগতি অবশ্য আজকের তুলনায় ছিল অকিঞ্চিৎকর। তবু কৌলীন্যশাসিত সেই সমাজে কুলশীলের সঙ্গত গর্ব তাঁরা যে মুখ ফুটেই করতেন তাতে সন্দেহ নেই। সায়া-সেমিজ-বক্ষবন্ধনী-ব্লাউজবর্জিত সমকালীন পরিধেয়ের যুগে যখন শাড়িখানামাত্র সম্বল করে তাঁদের লজ্জা ও ভব্যতা রক্ষা করতে হত তখন নানা ছাঁদের কবরীবিন্যাস বা দেশীয় উপাদানজাত এক-আধটু প্রসাধন (আলতা, কাজল, সিঁদুর, টিপ, ফুলমালা প্রভৃতি) এমন কিছু দোষাবহ ছিল না। আর, গুরুজনদের সব নির্দেশ ক্রীতদাসীর মতো মান্য না করে হয়ত তাঁরা কদাচিৎ নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করতেন। সেজন্য সমসাময়িক পুরুষশাসিত সমাজে কঠোর পারিবারিক গোঁড়ামির একচুল ব্যত্যয় ঘটালে তাঁরা যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য হবেন এমনটাই স্বাভাবিক। হয়েওছেন যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার প্রমাণ নীচের ছড়াটির সাত-সাতটি পাঠান্তর, যেগুলিতে মূল ছড়ার উলো, ন'দে, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া ছাড়া অগ্রদ্বীপ, রাণাঘাট, এমন কি দূরবর্তী বাথনাপাড়া, কলকাতা ও কালীঘাটের মেয়েরাও এসব 'অপরাধের' ভাগী হয়ে উপহসিত হয়েছেন। মূল ছড়াটি হল—

উলোর মেয়ের কুলকুলুটি (কুলগর্ব)। (নদীয়ার রাণাঘাট থানায়)
ন'দের (নবদ্বীপের) মেয়ের খোঁপা (প্রসাধনপ্রিয়তার প্রতীক)॥

শান্তিপুরে হাতনাড়া/নথনাড়া দেয়। (নদীয়ার অন্যতম থানাকেন্দ্র)
গুপ্তিপাড়ার চোপা (মুখর কটূভাষণ) ॥ (হুগলির বলাগড় থানায়)

পাঠান্তর,

উলোর মেয়ের কুলুজী,
অগ্রদ্বীপের খোঁপা। (বর্ধমানের কাটোয়া থানায়)
শান্তিপুরের হাতনাড়া,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

পাঠান্তর,

উলোর মেয়ের কুলকুলজী,
শান্তিপুরের খোঁপা।
অগ্রদ্বীপের হাতনাড়া,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

পাঠান্তর,

উলোর মেয়ের কলকলানি,
শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া,
বাঘনাপাড়ার খোঁপা ॥ (বর্ধমানের কালনা থানায়)

পাঠান্তর,

উলোর মেয়ের কলকলানি,
শান্তিপুরের খোঁপা।
ন'দের মেয়ের হাতনাড়া,
ক'লকাতার চোপা ॥

পাঠান্তর,

উলোর মেয়ের কুলো বাজানো,
শান্তিপুরের খোঁপা।
ন'দের মেয়ের হাতনাড়া,
কালীঘাটের চোপা ॥

পাঠান্তর,

রাণাঘাটের হাতনাড়ুনি,
শান্তিপুরের কলকলানি।

নবদ্বীপের খোঁপা,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

এ পাঠান্তরগুলির সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা 'চোপা'র জন্য চারটি ও 'হাতনাড়া'র জন্য একটি ছড়ায় উপহসিত হয়েছেন। তুলনায় শান্তিপুর-ললনাদের কৃতিত্ব বেশী বই কম নয়। তাঁরা প্রসাধনপ্রিয়তার ('খোঁপা'র) আতিশয্যে তিনটি, 'চোপা'র তীব্রতায় দুটি এবং 'হাতনাড়া' / 'নথনাড়া'র মর্মভেদিত্বে স্থান ক'রে নিয়েছেন একটি ক'রে ছড়ায়। উলোর নারীসমাজও স্বমহিমায় কম কিসে? তাঁরা কুলগর্বকীর্তনে তিনটি, 'চোপা'র ব্যবহারে দুটি ও 'কুলোবাজানো'র অভিনবত্বে একটি ছড়ায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন'দে-নবদ্বীপের প্রগতিশীলারাও পিছিয়ে প'ড়ে থাকেন নি। তাঁরাও 'খোঁপা' এবং 'হাতনাড়া' প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন দুটি ক'রে ছড়ায়। অগ্রদ্বীপ, বাযনাপাড়া, রাণাঘাট, কলকাতা ও কালীঘাটবাসিনীরাও এসব 'দোষে'র ভাগী হয়েছেন, তবে অল্পমাত্রায়। ছড়াগুলির বাস্তবভিত্তি কিছু থেকে থাকলে, এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, সেকালের নদীয়ার ন'দে-নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলো, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি তথাকথিত অগ্রসর জনপদগুলিতে ভ্রূণাকার নারী-প্রগতি এবং পুরুষশাসিত সমাজে স্বাধিকাররক্ষায় মেয়েলি অস্ত্রগুলির প্রয়োগ তখনই শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে যার ঢেউ কালক্রমে গিয়ে লেগেছে কাছে-দূরের হুগলি, বর্ধমান ও কলকাতার লোকালয়গুলিতে। আশ্চর্যের বিষয়, মূল পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু কৃষ্ণনগর বা গোয়াড়ি কিন্তু এ-ছড়াগুলিতে একেবারেই উল্লিখিত হয়নি। এখন দিনকাল পালটেছে; স্ত্রী-স্বভাবও পরিবর্তিত হয়েছে যথেষ্ট। হাতিয়ার হিসাবে কুলগরিমার প্রকাশ বা 'নথনাড়া'র আজ আর সেদিন নেই। তবে, লোকে বলে, আধুনিকাদের তূণে প্রসাধনপটুত্ব ও বাক্‌চাতুরীর (সেকালের 'খোঁপা' ও 'চোপা'র বর্তমান সংস্করণ) শরগুলি নাকি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ।

মেয়েলি বিচ্যুতির (feminine frailties) প্রতি কটাক্ষকারী প্রায়-অনুরূপ আরও কিছু ছড়া পূব ও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য কিছু স্থান সম্পর্কেও প্রচলিত। উদাহরণ, হাওড়া জেলার কয়েকটি গ্রামের মেয়েদের সম্বন্ধে নীচের ছড়াটি—

জয়পুরের চোপা, খাল্‌নার খোঁপা,
আমতার টান্ (উচ্চারণবৈশিষ্ট্য)।
কোঁদল দেখবি যদি
রামচন্দ্রপুরের মেয়ে আন্।

প্রথম তিনটি স্থান আমতা ও শেষেরটি সাঁকরাইল থানায় অবস্থিত। ২৪-পরগণার হাসনাবাদ থানার দুটি পল্লী সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ছড়ার দৃষ্টান্ত—

টাকীর মেয়ের টকটকানি। (হাসনাবাদ থানায়)
উলপুরের মেয়ে ঘরভাঙ্গানী ॥ (ঐ)

মুর্শিদাবাদের একটি ছড়া কান্দী থানার রসড়া গ্রাম বিষয়ে—

রসড়া গ্রামখানি রসের সাগর।
মেয়েতে মোড়লি করে, পুরুষ বাঁদর ॥

অপরটি প্রসঙ্গান্তরে অন্যতম থানা-সদর বেলডাঙ্গা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত হলেও, তার সুচারুতার জন্য পুনরুল্লেখযোগ্য—

বেলডাঙ্গার বেটি,
কথায় পরিপাটি।
কাজের নাইকো খোঁজ,
হাতনাড়াতেই ভোজ ॥

পুববাংলা থেকে প্রাপ্ত এ-জাতীয় ছড়ায় প্রথমটির লক্ষ্য শ্রীহট্টের দুটি গ্রাম বিশ্বাকুট ও বুড়িচুং-এর মেয়েরা—

বিশ্বাকুটের চোপা।
বুড়িচুং-এর খোঁপা ॥

অপরটি,
রাজঘাট—ঘাটপাট।
সিরাজকাটি—দুধের বাটি।
জাফরপুর—পাল্লার সুর।
ঘোড়াদাঁড়—মেয়েমানষির বড্ড বাড় ॥

অন্যার্থ, রাজঘাটে গৃহোপকরণ প্রচুর, সিরাজকাটিতে স্বাদু আহার্য সুলভ, জাফরপুরে পাইকারি বেচাকেনার ধুম আর ঘোড়াদাঁড়ের বৈশিষ্ট্য স্বতঃবোধ্য।

দুই বাংলায় এ-জাতীয় ছড়ার সংখ্যাগত তারতম্য থেকে কেউ যেন না মনে করেন, পূর্ববঙ্গবাসিনীরা বুঝি, তুলনায়, অনেক বেশী সহনশীল, শান্তশিষ্ট ও নীরব স্বভাবের। আপাতদৃষ্টিতে ধারণাটা হয়তো নির্ভুল নয়। কেননা, 'বাঙাল'-মেয়েরা যে 'ঘটি'-মেয়েদের থেকে বেশী কর্মতৎপর সেকথা সাধারণ্যে স্বীকৃত এবং তাঁদের ব্যবহৃত কথ্যভাষা ন'দে-শান্তিপুরের মিষ্টতা বা কপটতামাথা নয় বটে কিন্তু মনোভাবের সাফ্-সাফ্ প্রকাশে বেশ উপযোগী। এসব হাতিয়ার হাতে থাকতেও পদ্মাপারবাসিনীরা এক-আধটু প্রসাধনপ্রিয়তা, কুলগর্ব বা অন্য মেয়েলি

দুর্বলতার জন্য উপহসিত হয়েও যে 'চোপা' (ও আনুষঙ্গিক 'হাতনাড়া'/'নথনাড়া' প্রভৃতির) ঝটিতি প্রয়োগ থেকে বিরত থেকে অধোবদনী হয়ে থাকতেন এমন মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। অতএব, এই বিশেষ ক্ষেত্রে দুই বাংলার ছড়ার সংখ্যা-পার্থক্যের প্রকৃত কারণ, আমার একক প্রচেষ্টায় সাধিত সংগ্রহ-ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা। 'বাঙাল' বউ-ঝিদের সম্পর্কে এ-জাতীয় ছড়া আরও অনেক থাকা সম্ভব যা আমার নাগালে আসেনি। পরিতাপের সঙ্গে এই communication gap-এর কথা আগেও বলেছি।

নারীসুলভ দৌর্বল্যের অতীতে তাঁদের সত্য-মিথ্যা কলঙ্ককীর্তন করেও কিছু ছড়া রচিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত শান্তিপুর ও বরানগর সম্পর্কে চরিত্র-হননকারী দুটি ছড়ার বক্তব্য ছিল, যেখানে নাকি "এক-এক ঘরে তিন-তিন নাগর।" পূববাংলার শ্রীহট্টের দুটি গ্রাম সম্পর্কে অনুরূপ অখ্যাতি নীচের ছড়াটিতে সে-মাত্রাকেও ছাড়িয়েছে—

গুমগুমিয়া, পাঙ্গারাই। (গ্রাম দুটির নাম)
এগু (একজন) বেটীর নগু (নয়জন) আই (উপপতি)।
রাইত পুয়াইলে এগু নাই ॥

স্ত্রী-কলঙ্ক রটনাকারী কিছু ছড়া কদর্যতার জন্য মুদ্রণযোগ্য নয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুরূপ বক্রোক্তি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং প্রায়শই নারীঘটিত হয়নি। শ্রীহট্টের তিনটি পল্লী সম্বন্ধে নীচের ছড়াগুলি তার দৃষ্টান্ত—

বারো ঘর পীর, চৌদ্দ ঘর চুর (চোর)।
বসত করইন (করে)—নাম শ্রীপুর ॥

এবং তাজপুর, আবাজী, মাঝ দিয়া জুড়ি (খাল)।
দিন-অ (দিনে) করইন বাবুগিরি, রাইত-অ করইন চুরি ॥

ইংরেজিতে যাকে বলে wit and humour সেই মার্জিত বক্রোক্তি বা সরস কৌতুকে উজ্জ্বল আর কিছু ছড়াও আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সংখ্যা বেশী নয়। বাঙালি রসবোধবর্জিত কাঠখোট্টা এক জনগোষ্ঠী একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বরং উলটোটাই সত্যি। সেজন্য পরিহাসরসসমৃদ্ধ আরও অনেক ছড়া থাকা খুবই সম্ভব যা অন্বেষণের অপেক্ষায় এখনও মাঠেঘাটে পড়ে আছে। এই বর্গে প্রথম ছড়াটি ২৪-পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত পাশাপাশি কিন্তু পরস্পরবিরোধী দুই গ্রাম জয়নগর ও মজিলপুর সম্পর্কে। প্রথম গ্রামের জমিদার মিত্র ও দ্বিতীয়টির জমিদার দত্ত পরিবার। দত্তরা দাবি করেন বঙ্কিমচন্দ্র

চাকুরিসূত্রে বারুইপুরে থাকাকালীন বহুবার তাঁদের ভদ্রাসনে এসে থেকেছেন এবং তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের আখ্যানভাগ নাকি তাঁদের পারিবারিক ঘটনাভিত্তিক। মিত্রদের গৌরব অন্য প্রকার। তাঁরা অনেকগুলি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সেকালে কোন কোন জমিদার-বংশে যেমন ছড়াকার নিযুক্ত থাকতেন, এক্ষেত্রে, অন্তত জয়নগরের মিত্রদের অধীনে, সেরকম কেউ ছিলেন মনে হয়। কেননা, নীচের ছড়াটিতে পাকা হাতের আভাস স্পষ্ট। ছড়াটিতে মজিলপুরবাসীরা হিন্দু হয়েও যে গোগ্রাসে গোমাংসভোজী সেকথা সরাসরি না ব'লে প্রকারান্তে যা বলা হয়েছে তার নিহিতার্থ, তাঁরা নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণের উৎকট আগ্রহে গোবৎসের চামড়া এবং ক্ষুরও বাদ দেন না। ছড়াটি এই—

ওরে সাধের নই (মাদী) বাছুর,
আর যেয়ো না মজিলপুর।
মজিলপুরে গেলে পরে,
থাকবে নাকো চামড়া, ক্ষুর ॥

এই কপট ভঙ্গিটি পুববাংলার পাবনার একটি ছড়াতে এমন নিপুণ কৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে যে, প্রসঙ্গান্তরে সেটি পূর্বে উদ্ধৃত হলেও, সেটির পুনরুল্লেখের লোভ সংবরণ করা কঠিন—

তুমি কি, আমি কি ?
পাগলা আর পাগলী।
তোমার-আমার ঠিকানা ?
হেমায়েতপুর, পাবনা ॥

পুরুলিয়ার আনাড়ি নাপিতদের সম্বন্ধেও একটি কৌতুককর ছড়া আছে—

কামাতে পারে না নাপিত,
ধামাভরা ক্ষুর।
কামাতে কামাতে যায়
রঘুনাথপুর ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

চট্টগ্রামের 'মগধেশ্বরী' দেবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নীচের দ্বিপদীটিও কৌতুকরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রসূতিদের সাধভক্ষণ উপলক্ষে সে-দেবীর কাছে কেবল পাঁঠাই বলি দেওয়া হয়, কদাচ পাঁঠা-বলি হয় না। এই অভিনব প্রথার ভিত্তিতে রচিত ছড়াটি হল—

পাঁঠায় (পাঁঠাকে) কাটে, পাঠী নাচে।
পাঁঠা বলে, মগধেশ্বরী আছে ॥

ছড়াটির নিহিতার্থ সুবিদিত বাংলা প্রবাদ 'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে'-র অনুরূপ। অপরিণামদর্শী পাঠী জানে না যে, যথাকালে মগধেশ্বরীর কাছে তারও পালা পড়বে।

শ্রীহট্টে পানচাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মতো পাটকাঠির আচ্ছাদন-কক্ষ বা বরোজ নির্মিত হয় না। সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট অজস্র সুপারি গাছের কাণ্ডে পান-লতাকে লতিয়ে দেওয়া হয়। সেজন্য কাঁদি কাঁদি সুপারির নীচেই দেখা যায় পান-পাতার নিবিড় সমারোহ। আবার, গাছের ডগায় রাতকাটানো পাখিদের মলত্যাগের ফলে পান-পাতার যত্রতত্র অসংখ্য সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। এই অনভ্যস্ত দৃশ্যে শ্রীহট্টে নবাগত জনৈক বিস্ময়বিহ্বল ব্যক্তির উক্তিই পরিণত হয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কৌতুককর ছড়ায়—

কি দ্যাশ-অ (দেশে) আইলাম রে আল্লা!
দ্যাশ-র (দেশের) কী গুণ।
এক্কই গাছ-অ (গাছে) পান-হুপারি,
এক্কই গাছ-অ চুন ॥

আমাদের কষ্টার্জিত সংগ্রহে উভয় বাংলার অসংখ্য স্থানের নানা বিষয় সম্পর্কে নিন্দা-কুৎসা-বিদ্বেষ-অখ্যাতি-অপবাদ-অপযশ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ-উপহাস-পরিহাস-ঠাট্টা-কৌতুক ইত্যাদি আশ্রিত লৌকিক কথ্য ছড়ার আলোচনা এখানেই শেষ হল। এই সংকলনবহির্ভূত, সমশ্রেণীর আরও অনেক ছড়া যে নিশ্চয়ই আছে সেকথা আগেই বলেছি। অগণিত অপরিচিত ও ধন্যবাদার্হ সংবাদদাতা পত্রযোগে আমাদের নানা তথ্য পাঠালেও সংকলনটি একক প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতার জন্য পরিপূর্ণাঙ্গ হয়নি। আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য যোগাড়ে কুশলী কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থা যদি, আত্মপ্রচারের জন্য নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে এই দীর্ঘ-কালব্যাপী, বহুজনসাধ্য, দুরূহ অন্বেষণে ব্রতী হন, তাহলে আরও প্রচুর ছড়ার সন্ধান পাওয়া খুবই সম্ভব। এহেন উৎসাহবর্ধক টনিক আমার বরাতে অদ্যাবধি জোটেনি। জোটাতে হলে, বহুক্ষেত্রে, যে খোশামোদির প্রয়োজন, আমার তাতে চিরকালের গভীর অনীহা। তবু আমি প্রচণ্ড আশাবাদী। এ-গ্রন্থে যে-বিষয়ের সূত্রপাত করা হল, ভবিষ্যতে তা যে বহুগুণে সমৃদ্ধ হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। আপাতত, নিন্দামূলক ছড়ার বর্তমান ভাণ্ডারটিতে পরছিদ্রান্বেষী অথচ কৌতুক-

প্রিয় বলে কথিত বাঙালির সামাজিক চরিত্রের অল্পবিস্তর প্রতিফলন ঘটেছে কিনা সমাজবিজ্ঞানীরা তা ভেবে দেখবেন। সে-রকম সমীক্ষার সময় কোথায় কোথায় অকারণ আক্রোশবশত অতিশয়োক্তি বা মিথ্যা উক্তি করা হয়েছে, কোথায় বা হয়নি তার সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে যেজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্ষেত্রানুসন্ধান অপরিহার্য। যেমন, 'চোর, চোট্টা, হারামজাদ/এ তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ', কিংবা 'চোর, ছেঁচড়, গলাকাটা/এ তিন নিয়ে সুতাহাটা', অথবা 'বেহায়া, বেইমান, বাঁকা/এই তিন লইয়া ঢাকা'—এ ছড়াগুলিতে একটা গোটা জেলা, একটি থানা-এলাকা এবং বাংলার এককালীন সমৃদ্ধ রাজধানীর সমস্ত অধিবাসী উল্লিখিত গুরুতর দোষের ভাগী এমন হতেই পারে না। তবু মনোযোগী অধ্যয়নে যদি সেদিকে কোনও প্রবণতা লক্ষিত হয় তবে তা প্রণিধানযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক উপাদানরূপে গণ্য হতে পারে। আবার, কিছু ছড়া—যেমন, 'চোর, চোট্টা, খেজুরগুড়/এই তিন লইয়া ফরিদপুর' কিংবা 'মশা, মোল্লা, শাঁখা/এই তিন লইয়া ঢাকা'—সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত। ফরিদপুরের খেজুরগুড় এবং ঢাকার শাঁখা সেসব স্থানের গৌরবের বস্তু। আর, মোল্লা বলতে যদি কট্টর সাম্প্রদায়িক মুসলমান না বুঝিয়ে "মুসলমানদের ধর্মাচরণে পুরোহিতের মতো সহায়ক" ('চলন্তিকা') বোঝায়, তা হলেও নিন্দনীয় কিছু নেই। কিন্তু চোর চোট্টা ও মশার অখ্যাতি প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তী অধ্যায়ে নানা স্থানের গরিমা, বৈভব, প্রশংসাসূচক যেসব ছড়া উল্লিখিত হবে, সেক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য। সেখানেও অতি-কথন প্রায়শই অল্পবিস্তর বল্‌গাহীন। এসব বিচার-বিবেচনা সমাজতত্ত্ব-বিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন প্রশংসা-খ্যাতি-যশ-প্রসিদ্ধি-কীর্তি-গরিমা প্রভৃতিসূচক ছড়াগুলির আলোচনায় আসতে পারি।

আমরা অতঃপর সুখ্যাতি-যশ-কীর্তি-প্রসিদ্ধি প্রভৃতিসূচক স্থান-বিবরণী ছড়ার আলোচনায় অবতীর্ণ হব। অখ্যাতিমূলক ছড়ার তুলনায় তারা যে সংখ্যায় কম সেকথা আগে বলেছি। সংশ্লিষ্ট স্থানের সরাসরি গরিমাব্যঞ্জক ছড়ার কথা শুধু ধরলে, এ-উক্তি সত্য। কিন্তু বহু ছড়ায় স্থানবিশেষের সামগ্রিক গুণকীর্তনের পরিবর্তে সেখানকার আর্থনীতিক বা বাণিজ্যিক প্রাধান্য, প্রসিদ্ধ বস্তু, কৃষিপণ্য, মিষ্টান্ন, ব্যক্তিবিশেষ বা জনগোষ্ঠীর প্রশংসা, সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-ঐতিহাসিক গৌরব প্রভৃতির প্রশস্তিও দেখা যায়। সেগুলির সমাহারে

সুখ্যাতিমূলক ছড়ায় (যে নামকরণ অসঙ্গত নয়) নিদর্শন কিন্তু সুপ্রচুর। সেই যৌথ ভাণ্ডারের দৃষ্টান্তগুলিকে, সংখ্যাধিক্যের কারণে, আমরা উল্লিখিত পৃথক পৃথক বিভাগের অন্তর্গত ক'রে দেখাব যাতে সেগুলির শ্রেণীগত চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। কোনও উপ-বিভাগে উদাহরণের পরিমাণ যথেষ্ট হলে, তাদের সম্ভবমত, জেলাওয়ারি উপস্থিত করা হবে; অন্যথা সে-প্রয়োজন নেই। এই সমগ্র বর্গের প্রতি নিদর্শনেই প্রশংসা যে অবিমিশ্র এমন নয়। অখ্যাতিমূলক ছড়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, বহু স্থানে, এমন কি একই পঙ্‌ক্তিতে, দোষের সঙ্গে গুণেরও উল্লেখ ঘটেছে। পরবর্তী ছড়াগুলির আধেয়ের বেলায় একই উক্তি প্রযোজ্য। তবে অখ্যাতি থেকে খ্যাতির পরিমাণ বা গুরুত্ব যেসব ছড়ায় বেশী, সেগুলিই বর্তমান অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু।

প্রথমে নির্দিষ্ট গুণবাচক নয়, সামগ্রিক উৎকর্ষমূলক কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করি—

যার নাই পুঁজিপাটা।
সে যায় বেলেঘাটা॥

এখানে বেলেঘাটার কোনও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নেই। তবু নিঃসম্বল ব্যক্তি কেন সেখানে যায়? সুশীল দে মহাশয় তাঁর গ্রন্থভুক্ত এ-ছড়াটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেখানে তখন অনেক নতুন নতুন আড়ত স্থাপিত হচ্ছিল যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছাড়া সে-এলাকায় ভিক্ষাও সুলভ ছিল। প্রায়-অনুরূপ আর-একটি ছড়া আছে নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার এক গ্রাম সম্পর্কে—

যার নেই চালচুলো।
সে যায় পারকুলো॥

বেলেঘাটার আকর্ষণ-প্রকরণ পারকুলোতে বর্তমান না থাকলেও নাকাশিপাড়ার সিংহরায় পদবীধারী জমিদার-বংশের দানশীলতার খ্যাতি ছিল। বাঁকুড়ার পুর-শহর (municipal town) সোনামুখী সম্বন্ধে সমশ্রেণীর একটি ছড়া—

সোনামুখী মধুপুরী।
ঢুকলে বেরাতে (বা'র হতে) নারি॥

মেদিনীপুরের মহকুমা-শহর তমলুকের সামগ্রিক গুণপনার অপর একটি ছড়া—

খায়দায়, থাকে সুখে।
বাড়ি তার তমলুকে॥

পূর্ববাংলার পাবনা সম্পর্কে সমগোত্রীয় একটি ছড়ার বয়ান—

যার বাড়ি পাবনা।
তার কিসের ভাবনা॥

নদীয়ার চাকদা সম্বন্ধে নীচের ছড়াটিতেও সেখানকার বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ কারণ খুব স্পষ্ট নয়।

নগদা কড়ি।
চাকদা বাড়ি॥

সম্ভবত অস্যার্থ সেখানকার লোক ধারদেনা করে না, নগদেই কেনাবেচা করে। বর্ধমানের বিখ্যাত গ্রাম মানকড়ের প্রশস্তিতে রচিত একটি ছড়ার বক্তব্য, সে-লোকালয়ের উচ্চ সম্মানের জন্য রাজাকে কোনও কর দিতে হয় না—

মানই যার রাজার কর।
সেই গ্রাম মানকড়॥

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুব বড় একটি জনপদ ও অতি-বিস্তৃত একটি বিল সম্বন্ধে বিস্ময়মিশ্রিত সাধুবাদ—

গ্রাম দেখ কলম।
বিল দেখ চলন॥

গঙ্গা-ভাগীরথীর স্তুতিমূলক নীচের দুটি ছড়াতেও নির্দিষ্ট কোনও গুণাগুণ উল্লিখিত হয়নি—

গঙ্গা গঙ্গা ভাগীরথী।
পাপ নেই এক রতি॥
বৈরাগীর জাত নেই।
গঙ্গার ঘাট নেই॥

স্থানীয় খ্যাতি প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কারণহীন এসব দৃষ্টান্ত ছাড়া আরও অজস্র ছড়ায় বৈভব, গৌরব ও খ্যাতি, উৎপন্ন দ্রব্য ও সুলভ পণ্য, নানান সুখাদ্য ও মিষ্টান্ন, বৃত্তিগত বা অন্যবিধ জনগোষ্ঠী এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠান ও লক্ষণীয় প্রথা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় কীর্তিত হয়েছে। নীচের ছড়াটি সে-সবের এক মোটামুটি সামগ্রিক উদাহরণ যা প্রখ্যাত কবিয়াল 'ভোলা ময়রা'র মুখনিঃসৃত ব'লে কথিত—

মৈমনসিং-এর মুগ ভালো,
খুলনার ভালো খই।

ঢাকার ভালো পাতক্ষীর,
বাঁকুড়ার ভালো দই ।।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভালো,
মালদহের ভালো আম ।
উলোর ভালো বাঁদর-পুরুষ,
মুর্শিদাবাদের জাম ।।
রংপুরের শ্বশুর ভালো,
রাজশাহীর জামাই ।
নোয়াখালির নৌকা ভালো,
চট্টগ্রামের ধাই ।।
দিনাজপুরের কায়েত ভালো,
হাওড়ার ভালো শুঁড়ি ।
পাবনার বৈষ্ণব ভালো,
ফরিদপুরের মুড়ি ।।
বর্ধমানের চাষী ভালো,
চব্বিশ-পরগণার গোপ ।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো,
শীঘ্র বংশলোপ ।।
হুগলির ভালো কোটাল, লেঠেল,
বীরভূমের ভালো ঘোল ।
ঢাকের বাদ্যি থামলে ভালো,
বলো হরি হরিবোল ।।

তাৎক্ষণিকভাবে মুখে-মুখে রচিত এ ছড়াটিতে যে অবিভক্ত বাংলার শুধু দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, বরিশাল, কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া আর সব কয়টি জেলা কোন-না-কোন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, তা 'ভোলা ময়রা'র উন্নত কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। তা ছাড়া এটিতে কৃষি-পণ্য, বিখ্যাত বস্তু, সুখাদ্য, মিষ্টান্ন, সামাজিক গোষ্ঠী, বৃত্তিজীবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রভৃতির নিরবচ্ছিন্ন অবতারণাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নীচের ছড়াগুলি স্থানগত বৈভব সম্পর্কে। তারা সংখ্যায় কম যেহেতু মহিমা

বা ঐশ্বর্য উপযুক্ত পর্যায়ের না হলে তাদের এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বের গৌরব বা খ্যাতিভিত্তিক ছড়াগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

রাজা, জমিদার, হাতিঘোড়া।
এই লইয়া মৈমনসিং-ত্রিপুরা ॥

ধানী-জমি, বাদশাহী।
এ দুই লইয়া রাজশাহী ॥

ধনী, মানী, টাকা।
এ তিন লইয়া ঢাকা ॥

বিদ্যা, বুদ্ধি, টাকা।
এই লইয়া ঢাকা ॥

গাড়ি, ঘোড়া, টাকার তোড়া (পাঠান্তরে, ফুলের তোড়া)।
এ তিন নিয়ে উত্তরপাড়া ॥

সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীকূল ॥

শেষ ছড়াটির ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে ব'লে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। খ্যাতি ও গৌরবসূচক ছড়াগুলি, সংখ্যাধিক্যের জন্য, জেলাওয়ারি দেখানো হচ্ছে। এগুলি মিশ্র (খ্যাতিসূচক শব্দের সঙ্গে দু'একটি সাধারণ বস্তুর উল্লেখযুক্ত) এবং অ-মিশ্র (কেবল প্রশংসাসূচক শব্দযুক্ত) উভয় আঙ্গিকেই রচিত। পশ্চিম ও পুববাংলায় উত্তর থেকে দক্ষিণবর্তী জেলাগুলির ক্রম অনুসারে তারা উল্লিখিত। প্রথমে অবিভক্ত বঙ্গদেশ সম্পর্কে দুটি ছড়ার উল্লেখ ক'রে পরবর্তী উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে এই ক্রম অনুসৃত হবে—

উত্তরের মানুষ ভিতরে বুদ্ধি,
দখিনের মানুষ সাদা।
পুবের মানুষ চাঁদ সদাগর,
পছিমের মানুষ গাধা ॥

ছাজা, বাজা, কেশ।
তিন্‌মে বাংলাদেশ (পাঠান্তর, বাংলাদেশে বেশ) ॥

অর্থাৎ, বঙ্গভূমে ঘর ছাওয়ার রীতি, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও রমণীকুলের কেশবিন্যাস প্রশংসনীয়। ছড়াটি বিহারের ভাগলপুর-মুঙ্গের-পূর্ণিয়া অঞ্চলে প্রচলিত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রাণুর কথামালা' গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন— "বাঙালী মেয়েদের কেশসৌন্দর্য নামী। এখানে কথায় বলে, 'ছাজা, বাজা, কেশ, তিন্‌মে বাংলাদেশ'।" পূর্বোল্লিখিত ক্রম অনুসারে, (অর্থাৎ, ছড়াগুলি যে যে জেলা থেকে পাওয়া গেছে, তাদের উত্তর-দক্ষিণ ক্রম অনুযায়ী)। পশ্চিমবাংলার প্রথম জেলা পুরুলিয়ার সুখ্যাতিমূলক একটি ছড়া—

আথড়াই-এর মাটি।
বাহাদুরপুরের লাঠি।
আড়কালির ঘাঁটি ॥

অস্যার্থ, আথড়াই-এর মাটি উর্বরা, বাহাদুরপুরে স্থানীয় শক্তির উৎস লাঠি এবং বিহার সীমান্তে আড়কালির নজরদারি কেন্দ্রটি শক্তপোক্ত। প্রথম ও তৃতীয় স্থানটি ঝালদা এবং দ্বিতীয়টি বান্দোয়ান থানায় অবস্থিত। নীচের ছড়াটিতে বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত তিনটি জায়গা প্রশংসিত।

ওমরপুরের মাটি।
মীরহাট-বস্তিপুরের বেটি ॥

এই বর্গে নদীয়া জেলার দুটি ছড়া—

চিতল মাছের কোল।
শান্তিপুরের বোল ॥

গাড়ি, ঘোড়া, সওয়ারী।
তিন নিয়ে গোয়াড়ী ॥

হাওড়া জেলার বিখ্যাত গ্রাম আঁদুল-মৌড়ি (সাঁকরাইল থানায়) সম্পর্কে নীচের ছড়াটিও একই শ্রেণীর—

ধন, ধান, কৌড়ি (কড়ি)।
তিনে আঁদুল-মৌড়ি ॥

মেদিনীপুরের ছড়াটি কিন্তু মিশ্র-গঠনের—

বালি, বালিকা, বাদাম।
তিনে কাঁথির সুনাম।

কলকাতায় হাত বাড়ালেই টাকা বা easy money-র রঙিন কল্পনাপ্রসূত নীচের

ছড়াটি পূববাংলার কোন কোন গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভগ্নিকুলের মুখে এখনও শোনা যায়—

আমার ভাই চাকরি করে
কইলকাত্তার দালানে (অট্টালিকায়)।
ম্যালা ট্যাহা কামাই করে
সোনা গাড়ে (পোঁতে) পালানে (খিড়কির পিছনের মাটিতে) ॥
হেই সোনা আনামু,
তায় গয়না বানামু ॥

ঢাকা-বিক্রমপুরের যুব-সম্প্রদায় একদা লেখাপড়া ও কর্মতৎপরতায় বাংলার অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী অগ্রসর ছিলেন। ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে নানান সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ডাক্তারি, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিক্ষকতা, প্রশাসন প্রভৃতি পেশায় তাঁদের অনেকেই ছিলেন সেসব প্রান্তে পথিকৃৎ। এই উদ্যমী ও গুণবান সন্তানদের প্রশংসা নীচের ছড়াটিতে অতি অল্প কথায় বিধৃত—

বিক্রমপুরের পোলা।
আশি টাকা তোলা ॥

এই শতকের প্রথম পাদেও এক তোলা সোনার দাম পনর-বিশ টাকার বেশী ছিল না।

নীচের দুটি ছড়া শ্রীহট্টের নবীগঞ্জ অঞ্চলের প্রখ্যাত জনপদ ভাদেশ্বর সম্পর্কে—

ফুল ভালা নাগেশ্বর।
মাইয়া ভালা ভাদেশ্বর ॥

পাঠান্তর,
কাঠ ভালা নাগেশ্বর।
কন্যা ভালা ভাদেশ্বর ॥

আর-একটি ছড়ায় ভাদেশ্বরের অতিথিপরায়ণতার খ্যাতি জোরদার করবার জন্য নিকটবর্তী অন্য দুটি গ্রাম—ফুলবাড়ি ও রণিকাইলকে হেয় করা হয়েছে—

যবে গ্যালাম ফুলবাড়ি।
খাইলাম ছুরইনের (ঝাঁটার) বাড়ি ॥
যবে গ্যালাম রণিকাইল।
ভাত'র (ভাতের) নামে আইজ-কাইল ॥
যবে গ্যালাম ভাদেশ্বর।
তে (তবে) গিয়া পাইলাম ভাত'র জড় (স্তূপ) ॥

প্রশংসার গুরুত্ব বাড়াতে অনুরূপ আঙ্গিকে রচিত ছড়া পশ্চিমবঙ্গেও আছে—

ওতোরপাড়া—ধনের ঘড়া।
বালী—হাড় কালি॥

পণ্ডিতপ্রধান দরিদ্র বালী গ্রামের দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়ার ঐশ্বর্যকে এখানে আরও বড়ো ক'রে দেখানো হয়েছে।

কলকারখানাজাত দ্রব্য এবং কৃষিপণ্যের সুবাদেও বহু স্থান এসব ছড়ায় কীর্তিত হয়েছে। কৃষিপ্রধান অবিভক্ত বঙ্গদেশে প্রথম শ্রেণীর ছড়া যে দ্বিতীয় শ্রেণীর থেকে সংখ্যায় অল্প হবে এমনই স্বাভাবিক। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা অতঃপর হ্রস্বতর বর্গের দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করে দীর্ঘতর তালিকাটিতে হাত দেব। আমাদের ভারী ও মাঝারি শিল্পগুলি প্রধানত বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলায় কেন্দ্রীভূত। তবে বর্তমান সংগ্রহে বর্ধমানের অংশ অপেক্ষাকৃত কম। দূরবর্তী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও মেদিনীপুর থেকেও অল্প কয়েকটি ছড়া পাওয়া গেছে। সব ছড়াতেই যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কারখানাজাত পণ্যের কথা বলা হয়েছে এমন নয়। হঠাৎ হঠাৎ আনুষঙ্গিক অন্য কথাও এসে পড়ায় কিছু মিশ্র ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু মূল ভাবার্থের খুব ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রথমে কলকাতার একটি ছড়া দিয়ে শুরু করি—

জাহাজ, কুলি, চিটেগুড়।
এ তিন নিয়ে খিদিরপুর॥

হাওড়ার তিনটি ছড়া স্বতঃবোধ্য—

ছাতা, জুতো, পেঁটরা।
এ তিন নিয়ে ব্যাঁটরা॥ (হাওড়া পুর-শহরভুক্ত)
কল, কয়লা, উড়ে।
তিন নিয়ে বাউড়ে (বাউড়িয়া)॥ (উলুবেড়িয়া থানায়)
দাঁড়ি, মাঝি, পাইকার, ফ'ড়ে।
এ চার নিয়ে উলুবেড়ে॥

হুগলির ছড়াগুলিরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—

দড়ি, দড়া, আলকাতরা।
তিন নিয়ে শ্রীরামপুর-চাতরা। (শ্রীরামপুর থানায়)

ইট, টালি, চণ্ড (ছাদ ছাওয়ার বিশেষ টালি)।
তিনে কোতরং ॥ (উত্তরপাড়া থানায়)

চুন, সুরকি বালি।
তিনে ভদ্রকালী। (উত্তরপাড়া থানায়)

বর্ধমানের ছড়াটিতে বাণিজ্যিক ঝোঁক বেশী—

তিসির ধুলো, চট, পাট।
এ তিন নিয়ে মীরহাট ॥ (কালনা থানায়)

মুর্শিদাবাদের ছড়াটিতে স্থানীয় ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পগুলি কীর্তিত—

রেশম, কাঁসা, হাতির দাঁত।
এ তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥

নদীয়ার ছড়াটিও মাঝারি শিল্পসংক্রান্ত—

ইট, খোলা, টালি।
তিনে হাঁসখালি ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

মেদিনীপুরের দুটি ছড়ার মধ্যে নীচে প্রথমটির উল্লেখমাত্র করছি। কেননা এ-গ্রন্থের প্রথম দিকে সেটির ভিত্তিতে চন্দ্রকোণার এককালীন শিল্প-বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ছড়াটি হল—

বাহান্ন বাজার, তিপান্ন গলি।
তবে জানবি চন্দ্রকোণায় এলি ॥ (অন্যতম থানা-কেন্দ্র)

অপর ছড়াটির বয়ান—

কাঠ, কয়লা, পাট।
তিনে কোলাঘাট ॥

পাঁশকুড়া থানায় অবস্থিত, রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরবর্তী এই গঞ্জ-শহরটিতে উল্লিখিত পণ্যের বিপুল কারবার হয়ে থাকে।

কৃষিপণ্যসংক্রান্ত ছড়াগুলিকে আমরা পশ্চিমবাংলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-পুরুলিয়া (ও সংলগ্ন পশ্চিমাঞ্চল)-বাঁকুড়া-বর্ধমান-নদীয়া-হুগলি-হাওড়া-মেদিনীপুর-কলকাতা-২৪-পরগণা এবং পুববাংলার রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী-বগুড়া-পাবনা-মৈমনসিং-যশোহর- খুলনা- ফরিদপুর- বরিশাল- কুমিল্লা-নোয়াখালি-ঢাকা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট, এই জেলাওয়ারি ক্রম অনুসারে উল্লেখ করব কেননা অন্য

কোনও জেলা থেকে এ-শ্রেণীর ছড়া সংগৃহীত হয়নি অর্থাৎ, আমরা অগ্রসর হব মোটামুটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। কোনও জেলা উল্লিখিত না হলে বুঝতে হবে সেখানকার ছড়া সংগৃহীত হয়নি। আর-একটি কথা, এ-ছড়াগুলিতে উল্লিখিত প্রতিটি বস্তুই কৃষিপণ্য নয়; সে-জাতীয় দ্রব্য প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলেও আচমকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিসের আবির্ভাব মোটেই বিরল নয়। এ-রকম বৈসাদৃশ্য সব বর্গের ছড়াতেই দেখা যায়। উপরের জেলাওয়ারি ক্রম অনুযায়ী প্রথমে আসে মালদহ জেলা যেখান থেকে সংগৃহীত একটিমাত্র ছড়ার বয়ান—

আম, রেশম, ধান।
তিনে মালদার জান॥

পরবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদের ছড়াও মাত্র একটি—

ঘন বর্ষা, না হয় বান।
তবে হয় গদাইপুরে ধান॥ (রঘুনাথগঞ্জ থানায়)

বীরভূমসম্পৃক্ত ছড়ার সংখ্যা পাঁচটি; শেষেরটিতে অবশ্য ভাগীরথীর পুবে, সংলগ্ন জেলা মুর্শিদাবাদের একটি স্থান ঢুকে পড়েছে—

পাট, পুন্‌কা (শাকবিশেষ), পালং, পুঁই।
পুঁটি, মাগুর, ট্যাংরা, কই।
তবে জানবি মুরারই॥ (অন্যতম থানা-সদর)

বোলপুরের ধুলো। (অন্যতম মহকুমা-কেন্দ্র)
নান্নুরের মুলো। (অন্যতম থানা-সদর)
কীর্ণাহারের তুলো॥ (নান্নুর থানায়)

কাঠ, পাতা (শালপাতা), বাউড়ি।
তিনে শহর সিউড়ি॥ (জেলা-সদর)

পারকাঁদির মুলো। (রামপুরহাট থানায়)
গগনপুরের ধুলো॥ (মুরারই থানায়)
বাঁশোড়্যার বেটি। (সিউড়ি থানায়)
পাইকড়ের মাটি॥ (মুরারই থানায়)
বংশবাটির বেটি। (মুর্শিদাবাদের সুতী থানায়)
ধ'রে ধ'রে কাটি॥

পুরুলিয়ার তিনটি ও সংলগ্ন সামন্তভূম সংক্রান্ত একটি ছড়া নিম্নরূপ—

উই, পুঁই, ডিংলা (কুমড়ো)।
তিন নিয়ে পুরুল্যা ॥

কুল, বড়ি, আখের গুড় ।
তিন নিয়ে রঘুনাথপুর ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

গো-গাড়ি, বলদা (বলদ)।
দুই নিয়ে ঝালদা ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

তেল থাকতে রুক্ষ গা।
খরসান (শুকনো তামাকপাতা) খাবি তো সামন্তভূম যা ॥

বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার অন্তর্গত পাঁচাল গ্রামে ধানের প্রভূত ফলনের কথা একটি অতিরঞ্জিত ছড়ায় বিবৃত—

হাতি-ঠেলা ধানচাল।
তবে জানবি পাঁচাল ॥

অর্থাৎ, সেখানে শুকানোর আগে ধান, চাল ছড়িয়ে দেবার জন্য গরু-ছাগল বা হাত দিয়ে কাজ হয় না, হাতি লাগে।

বর্ধমানের ছড়াগুলিতে বিষয়বৈচিত্র্য বেশী—

ওল, কচু, মান।
তিনে বর্ধমান ॥

আমড়া, কুমড়া, ধান।
তিনে বর্ধমান।

পুঁই, আমড়া, ধান।
তিনে বর্ধমান।

আম, আমড়া, কুঁজরা (দেশজ) ধান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান ॥

নদীয়ার ছড়া একটিই যাতে বাসক নামের ওষধি-গুল্মকে স্থানীয় কথ্যভাষায় বলা হয়েছে বাকস।

বাঁশ, বাকস, ডোবা।
তিন ন'দের শোভা।।

হুগলির তিনটি ছড়ার প্রথমটিতে সংলগ্ন দক্ষিণের জেলা মেদিনীপুরেরও অংশ আছে—

ধান যোগায় মেদিনীপুর,
কলা যোগায় হুগলি।
খেজুর, আখে গুড় যোগায়,
ডোবা যোগায় গুগ্‌লি।।

কলা, কুমড়ো শাকের আঁটি।
এ তিন নিয়ে বড়িবাটি।। (শ্রীরামপুর থানায়)

কলাপাতা, কাঠের আঁটি।
এ দুই নিয়ে বৈদ্যবাটি ॥

পশ্চিমবাংলায় হুগলিতে সব থেকে বেশী কলা উৎপন্ন হয়। এ-তিনটি ছড়াতেই কলা/কলাপাতার উল্লেখ সে-তথ্যকে সমর্থন করে।
হাওড়ার দুটি ছড়ার প্রথমটিতে কৃষিপণ্যের সঙ্গে অবান্তর কিন্তু বিখ্যাত এক বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে।

সাঁতরাগাছির ওল ভালো। (জগাছা থানায়)
ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল ভালো ॥

অপরটি, হুগ্‌টে-বাটুলের পান। (বাগনান থানায়)
মঙ্গলঘাটের ধান ॥

মেদিনীপুরের যে-তিনটি ছড়া পাওয়া গেছে তার বিষয়বস্তু কিন্তু কেবল কৃষিপণ্য—

আম, আঁকড় (ওষধি-গুল্ম), আতা।
তিন নিয়ে গড়বেতা ॥ (অন্যতম থানা-কেন্দ্র)

কাঠ, পাতা, চাল।
তিন নিয়ে ঘাটাল ॥

ওল, জাউর (কচু) কিটনা (কুটকুটে)।
এই নিয়ে ময়না ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

কলকাতার ছড়াটি চেতলাসম্পর্কিত যা একদা ২৪-পরগণার শামিল ছিল। সেখানকার বৃহৎ হাটে বেচাকেনার প্রধান সামগ্রীগুলি সেটির উপজীব্য—

চাল, চিঁড়ে, ঝ্যাঁতলা (মাদুর)।
তিন নিয়ে চেতলা ॥

২৪-পরগণার তিনটি ছড়া নিম্নরূপ—

হাজিপুর, কুকড়াঘাটি। (ডায়মণ্ডহারবার থানায়)
চাল দেয় মুঠি মুঠি ॥

কলা, মুলো, শাকের আঁটি।
এ তিন নিয়ে নৈহাটি ॥ (অন্যতম থানা-কেন্দ্র)

টিকি, ঢেঁকি, শজনে-খাড়া।
এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া ॥ (জগদ্দল থানায়)

কৃষিসম্ভার বিষয়ে পুববাংলা থেকে যথেষ্ট ছড়া না পাওয়াটা অপ্রত্যাশিত। পেয়েছি মোট ১৪টি, তাও শুধু রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর ও শ্রীহট্ট জেলাগুলি সম্পর্কে। ঢাকা, মৈমনসিং, বরিশাল প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলা বাদ পড়া গভীর পরিতাপের বিষয়। যাই হোক, জেলাগুলির উল্লিখিত ক্রম অনুসারে এবার তাদের উপস্থিত করছি। রংপুরের ছড়া মাত্র একটি—

ধান, পাট, গুড়।
জেলা রংপুর ॥

দিনাজপুরের ভাগেও পড়েছে একটি—

চাল, চিঁড়ে, গুড়।
তিনে দিনাজপুর ॥

রাজশাহীঘটিত ছড়া তিনটি—

রাজা নাই, 'শাহী' নাই, রাজশাহী নাম।
হাতিঘোড়া কিছু নাই, আছে শুধু আম ॥

ঝাঁকা, খালোই, ডালা, বাঁশের সরঞ্জাম।
এই সবের তরে ক্যাশরহাটের নাম ॥

'খালোই' বাঁশের চিল্‌তেয় বোনা মাছ রাখার পাত্র আর 'ক্যাশরহাট' কেশরহাটের

স্থানীয় কথ্য-অপভ্রংশ। তৃতীয় ছড়াটিতে কিন্তু রাজশাহীর সঙ্গে অন্যান্য স্থানের প্রসিদ্ধ বস্তুও উল্লিখিত হয়েছে—

তরফের তরকারি।
জৈন্তাপুরীর নারী ॥
রাজশাইর (রাজশাহীর) আম।
ব্রাহ্মণবাইড়ার (ব্রাহ্মণবাড়িয়ার) জাম ॥

তরফ, জৈন্তাপুরী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যথাক্রমে, ত্রিপুরা ও কুমিল্লায় অবস্থিত। পাবনার ছড়াটি নতুন আঙ্গিকে রচিত ও চিত্তাকর্ষক—

উলুবন কোন্ পাড়া?—উল্লাপাড়া।
নাপিত, জোলা কোন্ পুর?—শাজাদপুর।
বিয়াইবাড়ি কোন্‌হানে?—মাছ, ধান যেহানে।

যশোহরের দুটি দৃষ্টান্তের প্রথমটি রচনাশৈলী ও সংক্ষিপ্ততার কারণে স্থান-বিবরণী ছড়ার এক আদর্শ নমুনা। অপরটির বাঁধুনি শ্লথ এবং বক্তব্যও অতিরঞ্জিত—

কই, চই, নীল্।
যশোরেতে মিল ॥

সে-জেলার কইমাছের খ্যাতি সুবিদিত। 'চই' গোলমরিচের বিকল্প একরকম ওষধি শিকড় যা নাকি রবীন্দ্রনাথ খেতেন। নীলের চাষও সেখানে হত যথেষ্ট। দ্বিতীয় ছড়াটি ঝিনাইদহ মহকুমায় অবস্থিত কালীগঞ্জের বিখ্যাত হাটে বিক্রীত গোলআলুর প্রশংসায় মুখর।

কালীগঞ্জের হাটে গ্যালাম।
রসোগোল্লা কিন্যা খাইলাম ॥
খাইয়া দেখি গোলআলু!
খোসা-পাতলা আলু রে ভাই।
এমন আলু জন্মে দেখি নাই ॥

ফরিদপুরের ছড়াটি মামুলি ধরনের—

চাল, চিঁড়া, পান, গুড়।
চার লইয়া ফরিদপুর ॥

শ্রীহট্টের (সিলেটের) চারটি ছড়া নিম্নরূপ—

চুন, কমলা, বাঁশ, বেত।
এই চাইর লইয়া সিলেত॥

বানিয়াচঙের কচু আর দুলালীর মুখী (গাঁঠি কচু)।
ছাতকের চুন খাইয়া সবাই হইবায় (হবে) সুখী॥

কদুপুরের কদু (লাউ)।
খাইতে বড় মধু॥

যবে গ্যালাম বালাউট।
আলু খাইয়া ভাঙলাম ঠুঁট (ঠোঁট)॥

শেষের ছড়াটি অবশ্য অখ্যাতিমূলক। তবে কৃষি-পণ্য সম্পর্কিত ব'লে এখানে উল্লিখিত হল।

অতঃপর আমরা সুখ্যাতিমূলক যেসব ছড়ার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব সেগুলিকে বস্তুবাচক, সুখাদ্যবাচক ও মিষ্টান্নবাচক এই তিন প্রশস্ত বর্গে ভাগ করা যেতে পারে। এখানেও শ্রেণীর পরিধি ডিঙিয়ে কোথাও কোথাও অবান্তর দ্রব্যের উল্লেখ বিরল নয়। কিছুক্ষেত্রে ছড়াগুলির জেলাওয়ারি বিভাজন সম্ভব হলেও, একাধিক জেলা (বা স্থান) একই ছড়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমনও দেখা যায়। সেজন্য আমরা এখানে জেলাওয়ারি কোনও ক্রম অনুসরণ করব না। তবে প্রতি জেলা বা স্থানের ছড়াগুলি একত্রে দেখানো হবে। প্রথমে বস্তুবাচক ছড়াগুলির উল্লেখ করি—

উদ্ধারণপুরের মেলা।
কলা আর শোলার মালা॥

উদ্ধারণপুরে বর্ধমানের বিখ্যাত মহাশ্মশান অবস্থিত। সেখানকার মেলায় বিক্রীত প্রধান বস্তু দুটি এখানে উল্লিখিত—

কলকাতার মাথাঘষা, খিদিরপুরের চিরুনি।
নোটন-খোঁপা বেঁধে দেব বেলফুলের গাঁথুনি॥

পাঠান্তর,

মেদিনীপুরের মাথাঘষা, কেষ্টনগরের চিরুনি।
এমন খোঁপা বেঁধে দেব বেলফুলের গাঁথুনি॥

মেহেরপুরের শাড়ি।
বেতাই-এর দাড়ি॥

অবিভক্ত বাংলায় মেহেরপুর ছিল নদীয়া জেলার এক মহকুমা-কেন্দ্র যাকে শাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শান্তিপুরের সম্পূরক ব'লে মনে করা হত। পরে সে-স্থান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বেতাই নদীয়ার তেহট্ট থানার এক মুসলমানপ্রধান গ্রাম যেখানে বহু শ্মশ্রুধারীর দেখা মেলে।

মোগল, মিশি, মাথাঘষা।
তিন দেখতে হুগলি আসা॥

বাংলায় সরাসরি মোগল-শাসনের কাল মোটামুটি খ্রীষ্টীয় সতর শতকের প্রথম দিক থেকে আঠার শতকের প্রারম্ভ অবধি। হুগলি তখন এ-অঞ্চলে অন্যতম প্রধান মোগল ঘাঁটি ছিল। সেই সুবাদে সেকালের শৌখিন জিনিসপত্র (মিশি, মাথাঘষা প্রভৃতি) সেখানে সুপ্রচলিত থাকা স্বাভাবিক।

পাণ্ডুয়াতে তাড়ি ভালো, চিনিদানার ছুঁড়ি।
চ্যাংনাতে হাঁড়ি ভালো, দিনাজপুরের মুড়ি॥

পাণ্ডুয়া হুগলির অন্যতম থানা-সদর এবং চিনিদানা তার কাছের গ্রাম। চ্যাংনার অবস্থান দিনাজপুরের বামনগোলা থানায়। ছড়াটিতে সেজন্য দুটি জেলায় (এখন দুই দেশে) অবস্থিত চারটি স্থানের সুখ্যাত বস্তু কীর্তিত হলেও জেলাওয়ারি শ্রেণী-বিভাগে সেটিকে হুগলি জেলার ব'লেই ধরেছি।

পুববাংলার অনুরূপ বস্তুবাচক ছড়ার প্রথমটি পাবনা সম্পর্কিত যার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'গ্রাম্য সাহিত্য' নিবন্ধেও পাওয়া যায়—

যুবতী ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থিক্যা আইন্যা দিমু ট্যাহা (টাকা) দামের মটরী॥

দ্বিতীয়টি চট্টগ্রাম সম্পর্কে—

সারেং, শুঁটকি, দরগা।
তিন নিয়ে চাটগাঁ॥

চট্টগ্রামের লঞ্চ-স্টিমার-জাহাজের চালক ও কর্মীরা সুখ্যাত। শুঁটকি-মাছ সেখানকার অতি রুচিকর খাদ্য। আর, মুসলমান জনাকীর্ণ এলাকায় যে বহু দরগা থাকবে এমনই স্বাভাবিক। এই শ্রেণীতেও শ্রীহট্ট সম্পর্কিত ছড়া তুলনায় বেশী—

চুন, কমলা, ভট্ট।
তিন নিয়ে শ্রীহট্ট ॥

ছাতকে চুন এবং সমগ্র জেলায় কমলালেবু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ভট্টাচার্য পদবীধারীরাও সেখানে নাকি সংখ্যায় প্রচুর।

ও মিঞা বেপারী, তোমার নাওয়ে (নৌকায়) কি ?
পাগলার হুকনা (শুষ্ক) মাছ, নবীনগরের ঘি ॥

শ্রীহট্ট জেলার দুই সুপরিচিত স্থান, পাগলা শুকনো (শুঁটকি) মাছ এবং নবীনগর ঘিয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

আর-একটি ছড়ায় চারটি স্থান সুখ্যাত জিনিসের জন্য কীর্তিত হয়েছে—

পাইলগাঁয়ের দাঁড়ী (দাঁড়-টানা মাঝি)।
গোরারং-এর বাড়ি (স্থানীয় জমিদারের প্রাসাদ) ॥
ফিরাগাঙের মাছ (সে-নদীর সুস্বাদু মাছ)।
শ্যামারচরের নাচ (সেখানকার ঘাটু-নাচ) ॥

ত্রিপুরার একটি ছড়া দিয়ে সুখ্যাত বস্তু সম্পর্কিত ছড়ার প্রসঙ্গ শেষ করছি—

পান, পানি, নারী।
তিনে জৈন্তাপুরী ॥

অস্যার্থ, জৈন্তাপুরীতে পানের ফলন যথেষ্ট, ভাত পচানো অনুগ্র মদ (vice-beer) সুপেয় এবং স্থানীয় মেয়েরা দর্শনীয়।

অব্যবহিত পূর্বের ছড়াগুলিতে মাছ, কমলালেবু, ঘি, শুঁটকি-মাছ প্রভৃতি সুখাদ্যের উল্লেখ সত্ত্বেও সুখাদ্যবাচক আর-একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রয়োজন কি ? পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, সেসব ছড়ায় ছুঁড়ি, হাঁড়ি, মটরী, সারেং, দরগা, চুন, দাঁড়ী-মাঝি, বাড়ি, নাচ প্রভৃতি অসংলগ্ন বস্তুরও উল্লেখ আছে। নীচের বস্তুবাচক ছড়াগুলি সে-ত্রুটি থেকে অনেকাংশে মুক্ত যদিও তাদের ঝোঁক মিষ্টান্নের দিকেই বেশী। সেজন্য তৎপরবর্তী বর্গে আমরা নিছক মিষ্টান্নবাচক ছড়ারই আলোচনা করব। এখন আলোচ্য সুখাদ্যবাচক ছড়া সংখ্যায় অল্প ; তাদের প্রথমটি (দুটি পাঠান্তর সহ) 'ছেলেভুলানো ছড়া'র অন্তর্গত এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

উদ্গোর ভুঁয়ের ময়দা আর সৈদাবাদের ঘি।
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি ॥

সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদের জেলা-সদর বহরমপুরের একাংশ।

পাঠান্তর, লাভপুরের ময়দা আর সিউড়ির ঘি।
বোলপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি॥

সিউড়ি বীরভূমের জেলা-সদর, বোলপুর সম্প্রতি উন্নীত হয়েছে এক মহকুমা-কেন্দ্রে, আর লাভপুর অন্যতম থানা-সদর।

পাঠান্তর, সৈদাবাদের ময়দা আর কাশিমবাজারের ঘি।
একটু সবুর করো খোকা, লুচি ভেজে দি॥

তিনটি পাঠান্তরের সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, উলো, লাভপুর ও সৈদাবাদে উৎকৃষ্ট ময়দা; সৈদাবাদ, সিউড়ি ও কাশিমবাজারে সরেস ঘি এবং শান্তিপুর ও বোলপুরে উত্তম কড়াই লভ্য। প্রতি ছড়ায় কীর্তিত স্থানগুলি (প্রথম পাঠের সৈদাবাদ ছাড়া) সবই এক-এক জেলায় অবস্থিত। এ থেকে ছড়াকারদের নিজ নিজ জেলার উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাই সূচিত হয়।

এবার আমরা মিষ্টান্ন সম্পর্কিত ছড়ার পর্যায়ে আসতে পারি। তাদের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও উৎপাদন-কেন্দ্রের ব্যাপকতা বিস্ময়কর। বাঙালি যে কতদূর মিষ্টান্নপ্রিয় তা নীচের ছড়াগুলি থেকে সুপ্রমাণিত হবে। ভোজনরসিক স্বর্গত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দৃষ্ট দেশগুলির যাবতীয় সুখাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ছিল, বাঙালি ময়রারা যত প্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুতে সমর্থ, ভূভারতে তেমন আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেছিলেন, উত্তর-ভারতীয়েরা (অন্তত তাঁদের মধ্যে সনাতনপন্থীরা) ছানা কাটাকে অতি গর্হিত কর্ম ব'লে মনে করেন যেহেতু গোমাতার দেহনিঃসৃত পবিত্র দুগ্ধকে বলপূর্বক এভাবে বিকৃত করা ঘোরতর ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। ফলে, সেই বিস্তীর্ণ এলাকায় তো বটেই, ভারতের আরও অনেক প্রান্তে ছানার মিষ্টান্ন নেই বললেই চলে। দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করলে কিন্তু পাপের ভাগী হতে হয় না ব'লে সেসব অঞ্চলের মোদকেরা উপকরণ হিসাবে প্রধানত ক্ষীরের উপরই নির্ভর করেন, বাঙালি ময়রাদের মতো অজস্র প্রকার ছানার খাবার তৈরীর বিন্দুবিসর্গ জানেন না। শুধু ক্ষীর বা ছানাই বা বলি কেন, বাঙালি ময়রারা আরও কত শত উপাদান যে ব্যবহার করে থাকেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই বহুমুখী উদ্ভাবনী প্রতিভা ও বংশানুক্রমিক কারিগরি দক্ষতাজাত লোভনীয় সব সুখাদ্য এখন ভারতবর্ষের

দূরদূরান্তে এমন কি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সমাদৃত। বাঙালির জীবনচর্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এসব আদরণীয় সম্ভারের প্রশস্তি যে তার গ্রাম্য-ছড়াতেও প্রতিফলিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, দূর পাড়াগাঁয়ে চিঁড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা, গুড়, চিনি, দই প্রভৃতি মর্যাদার প্রতিযোগিতায় শহুরে রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশ ইত্যাদির থেকে বিশেষ হীন নয়। যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট ছড়াগুলির উল্লেখে সেকথা স্পষ্ট হবে।

এখন, পূর্বনির্ধারিত জেলাওয়ারি ক্রম অনুসারে, যথাক্রমে এপার এবং ওপার-বাংলার ছড়াগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করছি। কোনও জেলা উহ্য থাকলে বুঝতে হবে, সে-জেলা থেকে ছড়া সংগৃহীত হয়নি। প্রথমে বীরভূম—

গুড়, মুড়ি, চিঁড়া, দই।
এ চার নিয়ে মুরারই ॥ (অন্যতম থানা-কেন্দ্র)

পরের জেলা পুরুলিয়ার ছড়া দুটি—

হ্যাদে চিঁড়া, হদে গুড়।
তবে জানবি / শহর বটে রঘুনাথপুর ॥ (অন্যতম থানা-কেন্দ্র)
তসর, চিঁড়া, ভেলিগুড়।
তিন নিয়ে রঘুনাথপুর ॥

নদীয়ার ছড়া তিনটি। কিন্তু প্রথমটিতে রঘুনাথপুরের 'তসর'-এর মতো, 'তাঁতের শাড়ি' কথাগুলি মিষ্টান্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন—

তাঁতের শাড়ি, নলেন গুড়।
দুই নিয়ে শান্তিপুর ॥

দ্বিতীয়টি, রাণাঘাটের পানতুয়া, বনগাঁর দই।
শান্তিপুরের কাঁচাগোল্লা, বাবু বলে কই ॥

তৃতীয়টিতে উল্লিখিত চারটি স্থানের দুটিই নদীয়ায় অবস্থিত ব'লে সেটিকে এই জেলাভুক্ত দেখানো হয়েছে—

কাশীর মালাই খ্যাত, জয়নগরের মোয়া।
রাণাঘাটের পানতুয়া, নবদ্বীপের খোয়া (খোয়া-ক্ষীর) ॥

হুগলির দুটি ছড়ার প্রথমটিতে উল্লিখিত 'কলা' এবং দ্বিতীয়টিতে 'সিঙারা'-কে মিষ্টান্ন বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এহেন অবান্তর বস্তুর অনুপ্রবেশের আলোচনা আগেই করেছি। ছড়া দুটির পাঠ—

তারকেশ্বরের 'রলা'। (স্থানীয় প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন)
বণ্ডিবাটির কলা ।।

গোপালপুরের রসকরা, জনাই-এর মনোহরা।
জাঙ্গিপাড়ার বাতাসা আর মশাটের সিঙারা ।।

কাছাকাছি অবস্থিত এ-চারটি গ্রামের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থটি চণ্ডিতলা থানায় অবস্থিত এবং জাঙ্গিপাড়া জেলার অন্যতম থানা-সদর।

হাওড়ার ছড়াটিতে একটি মিষ্টান্নই কীর্তিত।

ওরে আমার ননী!
সাধ গিয়েছে খেতে তোমার উলুবেড়ের ফেনী ॥
(বিশেষ ধরনের বড় বাতাসা)

নীচের ছড়াটিতে ২৪-পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত মোল্লারচক, হুগলির জনাই, এমন কি পুববাংলার যশোহরের উল্লেখ থাকলেও সেটিকে কলকাতার অন্তঃপাতী দেখাবার কারণ, বাঙালির মিষ্টান্ন-জগতে বাগবাজারের রসোগোল্লার নৈকষ্য-কৌলীন্য। ছড়াটি এই—

বাগবাজারের রসোগোল্লা, মোল্লারচকের দই।
জনাই-এর মনোহরা, যশোরের কই ।।

২৪-পরগণার অপর একটি ছড়ায় জেলাবহির্ভূত দুটি স্থান উল্লিখিত হলেও সে-জেলাভুক্ত স্থানের সংখ্যা তুলনায় অধিক।

হাজিপুরের তাল-পাটালি, (হুগলির গোঘাট থানায়)
বাহুলডাঙ্গার খই। (২৪-পরগণার ডায়মণ্ডহারবার থানায়)
ধামুয়ার রাঙা মুলো, (২৪-পরগণার মগরাহাট থানায়)
উলুবেড়ের দই ॥ (হাওড়ার মহকুমা-কেন্দ্র)

পুববাংলার ছড়ার মধ্যে প্রথম কয়েকটি ঢাকায় প্রচলিত—

ফতুল্লার চিড়া,
সিরাজদীঘার ক্ষীরা (পাত-ক্ষীর)।
রামপালের কলা,
তিন দিয়ে পেট ভরা ।।

এ-স্থানগুলি ঢাকা শহরের অদূরে। নীচের ছড়া দুটিতে উল্লিখিত অপর স্থানগুলি মুনশীগঞ্জে অবস্থিত।

ফতুল্লার চিড়া।
সিরাজদীঘার ক্ষীরা॥
ঘোলোঘরের কই।
শ্রীনগরের দই॥
রামপালের কলা।
মীরকাদিমের গোল্লা॥

পোড়াবাড়ির চমচম, বেতিলের দই।
ফতুল্লার চিড়া আর সোহাগপুরের খই॥

মৈমনসিং-এর মতো বড় জেলায় মিষ্টান্ন সম্পর্কিত প্রচলিত ছড়া পাওয়া গেছে মাত্র দুটি। প্রথমটিতে উল্লিখিত ফতুল্লা কিন্তু ঢাকার অন্তর্গত—

মুক্তাগাছার মণ্ডা, কৈলাসপুরের গুড়,
ফতুল্লার চিড়া, আর কাগমারের দই
—গামছা পাইত্যা লই॥

কাগমারের দই নাকি এত গাঢ় হত যে ক্রেতারা তা গামছায় বেঁধে নিয়ে যেতেন। পশ্চিমবাংলার মোল্লারচকের দইও একদা নাকি অনুরূপ খ্যাতির অধিকারী ছিল। দ্বিতীয় ছড়াটিতে নিমন্ত্রিতের মুখে অতি-সাধারণ মিষ্টান্নের প্রশস্তিতে আশ্চর্যের কিছু নেই এই কারণে যে মাটিঘেঁষা সেসব মানুষের কাছে টক দই এবং চিনিও উৎকৃষ্ট সুখাদ্য।

খাওয়াইল সাধের ম্যাজমানি (নিমন্ত্রণ)।
খামক্যাশরের চুকা (টক) দই, ফুলবাড়িয়ার চিনি॥

ফরিদপুরের ছড়া একটিই। তাও খুব সংক্ষিপ্ত—

দুধ, দই, গুড়।
তিনে ফরিদপুর॥

শ্রীহট্টের দুটি ছড়ার প্রথমটি একই হ্রস্ব আঙ্গিকের কিন্তু দ্বিতীয়টি যেন গল্প বলার ভঙ্গিতে রচিত—

হবিগঞ্জের দই। (মহকুমা-কেন্দ্র)
নবীগঞ্জের কই। (হবিগঞ্জ মহকুমার অন্যতম থানা-সদর)

করমচিতা, বৈকামুড়ার লামাত (ভাটির দিকে) আছে জুগনি।
বৈকামুড়ায় পীরের বাড়ি, চধ্‌রীবাড়ি (চৌধুরিবাড়ি) জুগনি॥

চধ্‌রিবাড়ির মদ্‌রি-পিঠা (বিশিষ্ট মিষ্টান্ন), গোয়ালবাড়ির দই।
কুলে মানে (সব মানুষে) খাইলা পিঠা, চধ্‌রি গেলা কই॥

করমচিতা ও বৈকামুড়া মৌলবীবাজার থানার অন্তর্গত দুটি সংস্কৃতিবাহী গ্রাম।

মিষ্টান্নসম্পৃক্ত ছড়ার আলোচনা এই ব'লে শেষ হতে পারে যে, এসব সুখাদ্য প্রস্তুতে নিয়োজিত অসামান্য কারিগরি দক্ষতা ও সেগুলির যথার্থ জনসমাদর বঙ্গ-সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অঙ্গ। কিছুকাল আগেও মার্জিতরুচি বাঙালি পুরনারীরা চন্দ্রপুলি, সন্দেশ, আমসত্ত্ব প্রভৃতি ছাঁচের সাহায্যে নানান সুচারু নকশায় মণ্ডিত করে অতিথিকে পরিবেশন করতেন। আমাদের কোন-কোন ধর্মীয় উৎসবের সময়েও নির্দিষ্ট মিষ্টান্নের ব্যবহার আবশ্যিক। যথা, বিবাহে আনন্দনাড়ু, জন্মদিনে পায়েস, দোল-পার্বণে মালপুয়া, হরিলুটে বাতাসা, লক্ষ্মীপূজায় নারকেল-নাড়ু, ঈদ-পরবে ফির্‌ণি প্রভৃতি। দৃষ্টান্ত আর না বাড়িয়ে, মিষ্টান্নকে বঙ্গ-কৃষ্টির অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ মনে করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে এবার আমরা বিদ্যাভ্যাস, ধর্মচর্চা, সঙ্গীতানুশীলন প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ছড়ার আলোচনায় অবতীর্ণ হতে পারি। ব্যাপক অর্থে, সেগুলিও প্রশস্তিসূচক ছড়ার সমগোত্রীয়। প্রথমে বিদ্যাস্থান সম্পর্কিত ছড়াগুলির উল্লেখ করি—

পরিপাটি বংশবাটি স্থান মনোহর। (হুগলির মগরা থানায়)
যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর॥
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস।
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বারো মাস॥

টোল আছে জয়পুরে। (নদীয়ার হাঁসখালি থানায়)
দিনরাত টিকি নড়ে।
দশ গাঁয়ের ছেলে পড়ে॥

পাঁজি, পুঁথি, স্তোত্র পড়া।
এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া॥ (২৪-পরগণার জগদ্দল থানায়)
কাগজ, কলম, কালি।
এ তিন নিয়ে বালী॥ (হাওড়ার অন্যতম থানা-সদর)

ধর্মচর্চা বিষয়ে ২৪-পরগণার পানিহাটিস্থিত পতাকাশোভিত বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে একটি ছড়া—

পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা-মন্দিরে॥

সঙ্গীতানুশীলন-কেন্দ্র সম্বন্ধে ছড়া আছে বেশ কয়েকটি—

গাইয়ে, বাজিয়ে, সুর।
তিনে বিষ্ণুপুর॥ (বাঁকুড়ার মহকুমা-কেন্দ্র)

গান, বাজনা, মতিচুর (মিষ্টান্ন বা সুগন্ধি তামাক)।
এ তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর॥

তাল, মান, সুর।
তিনে শিবপুর॥ (হাওড়া শহরের অংশ)

গান, বাজনা, সুজন।
তিন নিয়ে সিঙ্গারকোণ॥ (বর্ধমানের কালনা থানায়)

ধা, ধিন্, ধিন্‌ধা।
এই নিয়ে ছাতিন্দা॥ (মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানায়)

অম্বিকানগর গেছে গানে। (বাঁকুড়ার রানীবাঁধ থানায়)
খাতড়া গেছে দানে। (বাঁকুড়ার অন্যতম থানা-সদর)
রাইপুর গেছে বানে॥ (বাঁকুড়ার অন্যতম থানা-সদর)

শেষের ছড়াটিতে গান ছাড়া অন্য বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে ব'লে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। উল্লিখিত তিন স্থানের সচ্ছল জমিদার-বংশ পরে নিঃস্ব হন বিভিন্ন কারণে। প্রথম ক্ষেত্রে হেতু অত্যধিক সঙ্গীতপ্রীতিবশত অমিতব্যয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেহিসাবী দানধ্যান এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে বিধ্বংসী বন্যা। (পদ-লালিত্যের জন্য এই ত্রিপদীটি পরে কাব্যধর্মী ছড়ার পর্যায়েও ব্যবহৃত হবে।) বিহারের ভাগলপুর-পূর্ণিয়া-মুঙ্গের অঞ্চলে প্রচলিত এবং ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যাত "ছাজা, বাজা, কেশ। / তিন্‌মে বাংলাদেশ॥" এই দ্বিপদীটিতেও বাঙালির 'বাজা' অর্থাৎ বাদ্যসজ্জার এবং কেশবিন্যাস-প্রকরণের প্রশংসা করা হয়েছে। শ্রীহট্টের লংলা পরগণা সম্পর্কে নীচের ছড়াটিতে সেখানকার সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিবেশের কিছু আভাস পাওয়া যায়—

লংলা—ঘরে ঘরে বাংলা।
সাহেব জংলা, বিবি কাম্‌লা॥

অর্থাৎ, লংলার বাড়িগুলি বাংলো ধরনের, গৃহস্বামীরা অসভ্য কিন্তু গৃহকর্ত্রীরা কর্মঠ।

সুখ্যাতিমূলক ছড়ার আর-এক শ্রেণীতে স্থানীয় নামকরা ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর প্রশস্তি দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কৌতুক এবং বক্রোক্তিও আছে। এই বর্গের ছড়া বেশী পাওয়া যায়নি ; সংগৃহীতগুলি নীচে জেলাওয়ারি দেখানো হল। প্রথমে বীরভূমের দুটি দৃষ্টান্ত—

কলগাঁয়ের হেলে।
মোহনপুরের ছেলে ॥

কলগাঁ চারকলগ্রামের সংক্ষেপিত রূপ। দুটি পল্লীই নানুর থানায় অবস্থিত। ছড়াটির বক্তব্য—প্রথমটির হালবাহী কৃষক ও দ্বিতীয়টির যুবসম্প্রদায় কৃতী। অপরটিতে বীরভূমের জেলা-কেন্দ্র ও একটি থানা-সদর এবং বাঁকুড়া শহরের একজন করে ডাক্তারকে সেসব স্থানের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলা হয়েছে।

বাঁকুড়ার রামগতি।
সিউড়ির কালীগতি।
নলহাটির জগজ্যোতি ॥

এটি এক অতি-আধুনিক ছড়ার নিদর্শন। কেননা, কমবেশী ৩০-৪০ বছর আগে তাঁরা জীবিত ও সক্রিয় ছিলেন। সাবেককালের ছড়াসর্বস্ব এ-গ্রন্থে এ-রকম অর্বাচীন ছড়াও দু'চারটি থাকা ভালো। হাওড়ার ছড়াটিও সাম্প্রতিককালের যেহেতু সে-জেলার অন্যতম থানা-সদর বালীর প্রশস্তিতে যে-তিনজনের নাম করা হয়েছে তাঁরা বেশী দিন আগেকার লোক নন। ছড়াটির পাঠ—

'ছিরে,' 'বীরে', শান্তিরাম।
এ তিন নিয়ে বালীগ্রাম ॥

উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের পুরা নাম, যথাক্রমে, শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিরাম বন্দোপাধ্যায়। তাঁরা সকলেই ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতী এবং গ্রামের নানা উন্নতির হোতা। শেষোক্ত জনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত, সাহেবী আমলে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বালী রিভার্স টম্‌সন স্কুলটির নতুন নামকরণ হয়েছে বালী শান্তিরাম হাইস্কুল।

মেদিনীপুরের তিনটি ছড়ার প্রথমটিতে উল্লিখিত শংকরপুর সুতাহাটা থানায় অবস্থিত।

রাম রাউলের শাঁখা।
নবীন মাইতির পাকা॥
অনুপ জানার গান।
হরু দাসের ধান॥
সুভাষ নাপিতের ক্ষুর।
এই নিয়ে শংকরপুর॥

এ-ছড়ায় যাঁরা কীর্তিত, তাঁদের বিশদ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে এখন তা জানা সম্ভবও নয়। তাঁদের স্থানীয় প্রসিদ্ধি যে গ্রামের খ্যাতি বাড়িয়েছে এ-তথ্যটুকুই যথেষ্ট। তবে ছড়ার অতি-সংক্ষেপিত বিবরণ আবশ্যকবোধে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। অনুরূপ ছড়াগুলি সাধারণত এই প্রণালীতেই আলোচিত হবে। যেমন, রাম রাউল ছিলেন সে-অঞ্চলের প্রখ্যাত শঙ্খশিল্পী; নবীন মাইতির পাকা বাড়ি ছিল এক দর্শনীয় বস্তু; অনুপ জানা ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ; ভূস্বামী হরু দাসের ধানের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত আর সুভাষ নাপিত ছিলেন ক্ষৌরকর্মে দক্ষ। এসব সুসন্তানের সুবাদেই শংকরপুরের প্রসিদ্ধি।
দ্বিতীয় ছড়াটি ময়না থানার বিভিন্ন ব্যক্তিসম্পর্কিত কিন্তু রচনার আঙ্গিক একই—

দে, নন্দীর টাকা।
কুচল মাঝির পাকা॥
দাসের ঘরে ধান।
ময়না-রাজার মান॥

অস্যার্থ, পাঁশকুড়া থানার দে ও ডেবরা থানার নন্দী-পরিবার ছিলেন খুব ধনী জমিদার, পিংলা-সবং অঞ্চলের কুচল মাঝির ছিল বহু পাকা বাড়ি, ময়না থানার দাসেরা ছিলেন প্রচুর ধানের মালিক আর ময়নার রাজারা ছিলেন উচ্চ সম্মানের অধিকারী।
সুতাহাটা এলাকায় প্রচলিত কৌতুকাশ্রিত তৃতীয় ছড়াটির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

শরৎ দাসের সিনিমা।
চকচকে আর ডায়নামা॥
মুহুর মুহুর ফিলিম্ কাটে।
পয়সা লিবার ছলনা॥

কলকাতার কিছু গণ্যমান্য লোক ও তাঁদের পরিচয়-প্রতীকবাহী একটি ছড়া আছে (পাঠান্তর সহ) যাতে সমকালীন সমাজের নানান তথ্য নিহিত—

বনমালী সরকারের বাড়ি।
গোবিন্দরামের ছড়ি॥
উমিচাঁদের দাড়ি।
হুজুরীমলের কড়ি॥

পাঠান্তর,

নন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি॥
নকু ধরের কড়ি।
মথুর সেনের বাড়ি॥

ছড়াটিতে (পাঠান্তর সহ) উল্লিখিত এসব ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছড়াটির অর্থবোধে সাহায্য করবে। বনমালী সরকার ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট ধনী ব্যবসায়ী। খ্রীষ্টীয় ১৮ শতকে নির্মিত তাঁর কুমারটুলির বাড়ি এক দর্শনীয় বস্তু ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলকাতার কালেক্টরের সহকারীরূপে প্রভূত ধনোপার্জন করেন ও বাগবাজারে বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশের জমিতে এক সুউচ্চ কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা এখন লুপ্তপ্রায়। তাঁর ব্যবহৃত ছড়ির খুব বাহার ও বৈচিত্র্য ছিল। কোম্পানীর দালালরূপে অর্জিত বিত্তশালী শিখ বণিক উমিচাঁদ সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। তাঁর লম্বা দাড়ির খ্যাতি ছিল। হুজুরীমল ছিলেন উমিচাঁদের শ্যালক এবং জগৎ শেঠের মুৎসুদ্দি। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উমিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়করূপে তিনি প্রভূত ধনশালী হন। কলকাতার প্রথম 'রিসিভার অব রেভেনিউস্' রাল্‌ফ সেল্ডনের সহকারী ছিলেন নন্দরাম সেন। সে-পদের নানা সুযোগসুবিধায় প্রচুর অর্থাগমের ফলে তিনি শৌখিন স্বভাবের ধনীতে পরিণত হন। তাঁরও চটকদার ছড়ি ব্যবহারের অভ্যাস ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ধর (ওরফে নকু ধর) ছিলেন কোম্পানীর বেনিয়ান। সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভের অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসাবে মুর্শিদাবাদের লুণ্ঠিত কোষাগারের ৮ কোটি টাকার এক উল্লেখ্য অংশ তিনি নাকি পেয়েছিলেন। তাঁর বিত্তের সীমা ছিল না। পোদ্দার ও ব্যাংকার মথুর সেনের যশোহরে ৫টি নীলকুঠি ছিল। নিমতলাঘাট স্ট্রীটে,

বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে, কলকাতার লাটপ্রাসাদের অনুকরণে এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন।

পূববাংলা থেকে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর ছড়া শুধু পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিং, যশোহর, খুলনা ও শ্রীহট্ট সম্পর্কিত। এই জেলাওয়ারি ক্রম অনুসারে সেগুলির উল্লেখ করছি। পাবনার শাজাদপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছড়াটির পাঠ—

রমণী সা আস্ত গরু খায় না শুধু খ্যাড় (খড়)।
রতীনবাবুর দোকানে চোদ্দ ছটাকে স্যার (সের)॥
দুধ খায় না, ঘি খায় না, গদাধর সা মোটা।
টাকাকড়ি কামায় না মহাদেব সা'র ব্যাটা॥

আগেই বলেছি, এসব ব্যক্তিভিত্তিক গ্রাম্য ছড়ায় উল্লিখিত লোকজনের বিশদ পরিচয় অনাবশ্যক এবং বহু ক্ষেত্রে এখন হয়তো সংগ্রহসাধ্যও নয়। স্থানীয় সমাজে তাঁরা যে উল্লেখনীয় ছিলেন তা-ই যথেষ্ট এবং তাঁদের চরিত্র তো ছড়াতেই মোটামুটি স্পষ্ট। পরবর্তী ছড়াটি ঢাকার। সেটি ব্যক্তিভিত্তিক নয়, গোষ্ঠীভিত্তিক। পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে ব'লে এখানে সেটির শুধু উল্লেখ করছি।

বিক্রমপুরের পোলা।
আশি টাকা তোলা॥

মৈমনসিং-এ প্রচলিত তিনটি ছড়ার প্রথমটি অবিকল কলকাতার ছড়ার আঙ্গিকে রচিত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নের পরিচয়বাহী—

হামিদ আলির দাড়ি।
জৈমুদ্দির বাড়ি॥ (তিনি ঘনঘন বাড়ি পালটাতেন)
টুরি মুকুন্দের ভুঁড়ি।
কেষ্টহরির হুড়ি (কবিগান)॥

অন্য দুটি কৌতুকাশ্রিত। যেমন—

ইস্তাজ মিঞার লম্বা দাড়ি,
ফাজিল মিঞার ঘ্যাঘ (গলগণ্ড)।
পচা শ্যাখের বগ্‌বগানি (বক্‌বকানি),
য্যান (যেন) আষাইঢ়া (আষাঢ়ের) ম্যাঘ (মেঘ)॥

উমেদ ফকিরের ঘড়ি। (যা কখনই চলে না)
তমিজুদ্দিনের বিড়ি। (যা খালি নেবে)

কুন্দ কবিরাজের বড়ি ।। (যাতে রোগ সারে না)
মৃন্ময় চন্দের মালা। (ধূর্তের জপমালা)
বিশ্বাস করে কোন্ শালা ।।

পরবর্তী ছড়াটির উৎস অভিনব। যশোহর-খুলনার ঘটকেরা বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করবার জন্য এ-রকম ছড়া রচনা ও আবৃত্তি করে ওই দুই জেলার সম্ভ্রান্ত বংশগুলির পরিচয় দিতেন—

গুরুত্যাগী শিবরাম রুদোঘরার বাস।
'বলা', 'লোহা' দুই ভাই কন্দনপুরের 'দাস' ।।
সিদ্ধিপাশার সাত ভাই, চাঁপাঘাটের 'খেলা'।
এক্তারপুরের দয়ারাম, নেহালপুরের 'বলা' ।।
ভাটলার 'ভাটলী বামুন' আর কংসরাম।
স্বনামধন্য পুরুষ এঁরা, কুলেশীলে নাম ।।

অস্যার্থ, খুলনার রুদোঘরা গ্রামনিবাসী তেজস্বী শিবরাম মতান্তর হওয়ায় নিজ গুরুকে ত্যাগ করেন। যশোহরের কন্দনপুরে বারুজীবী সম্প্রদায়ের বলরাম দাস ও লোহারাম দাস দুই ভাই ছিলেন এত প্রতিপত্তিশালী যে সাধারণ্যে তাঁদের পরিচয় ছিল 'কন্দনপুরের দাস' নামে। যশোহরের সিদ্ধিপাশায় কায়স্থ দত্ত-বংশের সাত ভাইয়েরও নামডাক ছিল যথেষ্ট। আর-এক স্বনামধন্য পুরুষ খেলারামের জন্মস্থান খুলনার চাঁপাঘাট গ্রামে। যশোহরের এক্তারপুরবাসী কায়স্থবংশীয় দয়ারাম বিশ্বাস কৌলীন্য প্রথার প্রবল সমর্থক ছিলেন। যশোহরের নেহালপুর গ্রামের বলরাম হালদারও প্রতিপত্তিতে কম ছিলেন না। যশোহরের ভাটলা পরগণার 'ভাটলী বামুন'রা পিরালী-ব্রাহ্মণদের (যে-শ্রেণীর এক বংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম) মতোই ছিলেন পতিত ব্রাহ্মণ। কংসরাম ছিলেন যশোরের ভাটলা পরগণার অন্তর্গত জাকরপুর জনপদের এক খ্যাতনামা ব্যক্তি। এসব সম্ভ্রান্তজন ও তাঁদের বংশ-পরিচয় ঘটকদের মুখে মুখে কীর্তিত হবার সুযোগে এই অসাধারণ ছড়াটির সৃষ্টি হয়েছে। শুধু যশোহর-খুলনাতেই নয়, সে-অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের ঘটকরাও, পেশাগত কারণে, আরও অনেক অনুরূপ ছড়া রচনা করে থাকবেন যেগুলি অনুসন্ধানযোগ্য।

শ্রীহট্টের ছড়াটিতে জনৈক সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহানুভব ব্যক্তি কীর্তিত। নীচের ছড়ায় তাঁকে তুলনা করা হয়েছে সে-এলাকার বৃহত্তম হাওড় (জলাভূমি) হাকালুকির সঙ্গে, যার কাছে অন্যান্য বিল পরিসরে যেন কুয়া। ছড়াটির পাঠ—

হাওড়ের মধ্যে হাকালুকি,
আর সব কুয়া।
মাইনষর (মানুষের) মধ্যে গোলাম রব্বানী,
আর সব পুয়া ('পোলা' অর্থাৎ শিশু)॥

দুই বাংলার কোনও মহীয়সী মহিলা সম্বন্ধে এহেন প্রশস্তিবাচক ছড়া প্রচলিত না থাকাটা পরিতাপের বিষয়। হাওড়ার ভুরশুট রাজবংশের রানী ভবশংকরী (যাঁকে শৌর্যের জন্য আকবর বাদশা 'রায়বাঘিনী' উপাধি দিয়েছিলেন), রাজশাহী-নাটোরের স্বনামধন্যা রানী ভবানী, দক্ষিণেশ্বরখ্যাত রানী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদামণি প্রমুখ সম্পর্কে প্রত্যাশিত ছড়ার একটিও সংগৃহীত হয়নি। সে যাই হোক, উল্লিখিত ছড়াগুলির বেশ কয়েকটিতে ব্যক্তিবিশেষের নাম ধ'রে কটুকাটব্য করা হলেও স্থানীয় সামাজিক সম্প্রীতি যে তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি (বা হ'ত না) সে-বিষয়টি সমাজতত্ত্বের দিক'থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ-রকম ঘটনা আজ ঘটলে মানহানির মোকদ্দমা তো বটেই, খুনখারাপিও হতে পারত। সেকালের গ্রাম-সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, কৌতুককে অভিপ্রেত অর্থেই গ্রহণ করবার ঔদার্যসূচক এ-নিদর্শনগুলি এখনও আমাদের পাণ্ডিত্যাভিমানী সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ব'লে মনে হয় না। কেননা, সুকঠিন পরিশ্রমসাধ্য গ্রাম-পরিক্রমায় গভীর অনীহা ও অক্ষমতাবশত তাঁদের উচ্চনাদী বাণীসমুদয় সাধারণত বিতরিত হয়ে থাকে গৃহকোণ বা পাঠাগারের আরামকেদারা থেকে। এই শ্রেণীর অনেক ছড়া এখনও মাঠেঘাটে প'ড়ে আছে সংগ্রহের অপেক্ষায়। গজদন্তমিনারবাসী আমাদের সমাজবিজ্ঞাচঞ্চুরা কি সেগুলির সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে উৎসাহিত হবেন?

পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে খ্যাতি ও অখ্যাতিমূলক ছড়ার দীর্ঘ সমীক্ষার পরে পৃথক একটি বিষয়সংক্রান্ত ছড়ার আলোচনায় এখন অবতীর্ণ হচ্ছি যেগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মীয়, বর্ণগত, বৃত্তিগত বা সামাজিক শ্রেণীগত পরিচয় পাওয়া যায়। এই বর্গের উদাহরণগুলিতে তথ্যের ভ্রান্তি কম, কেননা সে-রকম কিছু ঘটলে স্থানীয় বাসিন্দারা আপত্তি তুলে নিশ্চয়ই তা অপনোদন করতেন। অবিভক্ত বাংলার নানা স্থানে সেকালের সমাজবিন্যাস কি রকম ছিল তার অনেক মূল্যবান নৃতাত্ত্বিক উপাদান এসব ছড়ায় পরিবেশিত হয়েছে। অন্যান্য পরিচ্ছেদের

মতো এখানেও যুক্ত বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণবর্তী জেলাগুলির ক্রম অনুসারে ছড়াগুলি উল্লিখিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ ১৬টি এবং বাংলাদেশের ১৯টি জেলার মধ্যে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে শুধু জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, কলকাতা এবং নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলা থেকে। আলোচ্য ছড়াগুলিকে এখন সেই পরম্পরা অনুযায়ী উপস্থাপিত করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের রাজবংশী সধবারা যে কেবল এক হাতে শাঁখা পরেন সে-তথ্য নীচের ছড়াটির বিষয়বস্তু—

তেঁতুলগুলি থোপা থোপা,
আমগুলি সব পোকা।
এমন দ্যাশ দ্যাখ্‌ছ নি ভাই
মাইয়ারা এক হাতে পরে শাঁখা ॥

বীরভূমের ছড়াটির পাঠ—

হাড়ি, মুচি, বাউড়ি। (তিন শ্রেণীর অবনত জাত)
এ তিন নিয়ে সিউড়ি ॥ (জেলা-সদর)

পুরুলিয়ার ছড়াটি নিম্নরূপ—

জেলে, কলু, নাপ্‌তের ক্ষুর।
এ তিন নিয়ে রঘুনাথপুর ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

বাঁকুড়ায় ছড়াও সংখ্যায় একটি—

বামুন, কায়েত, 'ম্যাচা'র জোর।
এ তিন নিয়ে বেলেতোড় ॥ (বড়জোড়া থানায়)

শিল্পী যামিনী রায় ও ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজের পিতৃভূমি বেলিয়াতোড় (স্থানীয় কথ্য-উচ্চারণে 'বেলেতোড়') 'ম্যাচা' নামের এক মিষ্টান্নের জন্যও প্রসিদ্ধ। বর্ধমানের ছড়া চারটি। প্রথমটিতে বর্ধমান-রাজবংশ যে খেত্রীজাতীয় অবাঙালি তার আভাস আছে—

খেত্রী, আগুড়ি (উগ্রক্ষত্রিয়), মোছলমান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান ॥

চাষা, ময়রা, মোছলমান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান ॥

পাল, ভট্টচাজ, খাঁ।
তিনে মানকড় গাঁ॥ (গল্‌সি থানায়)

কোলে, বেলে, খাঁ। (পদবী বিশেষ)
তিনে কুলীন গাঁ (কুলীনগ্রাম)॥ (মেমারি থানায়)

হুগলির ছড়াগুলি নিম্নরূপ—

উড়ে, মেড়ো, হিজড়া।
এ তিন নিয়ে রিষড়া॥

হড় (পদবীবিশেষ), হাড়ি, হিজড়ে।
এ তিন নিয়ে রিষড়ে॥

বামুন, বদ্যি, বাঁশের গোড়া।
এ তিন নিয়ে ভাঙামোড়া॥ (পুরশুড়া থানায়)

সে-গ্রামে বাঁশের আবাদ নাকি প্রচুর।
হাওড়ার ছড়ার সংখ্যা সর্বাধিক—আটটি—

হাড়ি, শুঁড়ি, নেড়ে।
তিনে গোহালবেড়ে॥ (শ্যামপুর থানায়)

দাঁড়ী, মাঝি, ফ'ড়ে।
তিনে উলুবেড়ে॥ (অন্যতম মহকুমা-কেন্দ্র)

পাঠান্তর, দাঁড়ী, মাঝি, পাইকার, ফ'ড়ে।
এ চার নিয়ে উলুবেড়ে॥

উলুবেড়িয়া এক সমৃদ্ধ গঞ্জ-শহর। সেখানে প্রধানত যে-শ্রেণীর লোকের আনাগোনা তারাই এ-ছড়া দুটিতে উল্লিখিত হয়েছেন। লক্ষণীয়, শেষ দ্বিপদীটিতে তিনের জায়গায় চার রকম লোকের কথা বলা হয়েছে যা 'তিনের ছড়া'র (পূর্বে ব্যাখ্যাত) আঙ্গিকের ব্যতিক্রম।

দুলে[১], কাপালী[২], মুচুরমান[৩]।
এ তিন নিয়ে বাগনান॥ (অন্যতম থানা-সদর)

---

১. পালকিবাহক; ২. কাপালিকের অপভ্রংশ; ৩. মুসলমান;

রায়, বাঁড়ুজ্জে, মোল্লা।
এ তিন নিয়ে থাল্লা (থাল্‌না)॥ (বাগনান থানায়)

গয়লা, জেলে, নেড়ে।
তিনে শ্যাওড়াবেড়ে॥ (আমতা থানায়)

কাঁড়ার[১], করাতী[২], জোলা।
তিনে সোনাতলা॥ (উদয়নারায়ণপুর থানায়)

ঘোষ, বোস, মিত্র এঁরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি॥

বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে শেষের ছড়াটির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় সেটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন তাঁর 'প্রবাদ রত্নাকর' গ্রন্থে (ওরিয়েন্ট সংস্করণ : ১৯৫৭) এ-বিষয়ে নিম্নলিখিত টীকা দিয়েছেন—

> খৃঃ অষ্টম শতকের শেষভাগে বাংলার হিন্দু রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। তাঁহারা বাংলার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্বপুরুষ, এই প্রসিদ্ধি। শেষোক্তগণের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র ও বিরাট গুহকে খৃঃ ১২শ শতকে রাজা বল্লালসেন কৌলীন্য-মর্যাদা দিয়াছিলেন। কিন্তু বালীগ্রাম-নিবাসী পুরুষোত্তম দত্ত ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার না করায় কৌলীন্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

আর-একটি কথা, হাওড়ার এ-ছড়াগুলির দুটিতে 'নেড়ে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমান অর্থে এ-শব্দটির ব্যবহারে কারও মর্মাহত বা অপমানিত বোধ করবার কারণ নেই। নানা যুক্তি সহযোগে আমরা ইতঃপূর্বেই স্থির করেছি যে, গ্রাম্য ছড়ার উদ্ধৃতিকালে মূল বয়ানের পরিবর্তে শিষ্ট ভাষার প্রয়োগে সেগুলিকে 'ভদ্রস্থ' করা অসমীচীন। এদেশে আগত আদি পীর-ফকির-দরবেশ-মোল্লা এবং ধর্মপ্রাণ বহু মুসলমান প্রায়শই মুণ্ডিতমস্তক থাকতেন ব'লে লৌকিক কথ্যভাষায় তাঁদের পরিচয়জ্ঞাপক এই শব্দটি এযাবৎ চ'লে এসেছে। ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ ক'রে মুণ্ডিত কেশ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা যখন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁদেরও 'নেড়ানেড়ী' বলা হয়েছে শুধু যথাযথ বর্ণনার প্রয়োজনে, তুচ্ছার্থে নয়।

১. পদবীবিশেষ; ২. কাঠ-চেরাই শ্রমিক।

মেদিনীপুর থেকে সংগৃহীত সমাজবিন্যাস সংক্রান্ত একটিমাত্র ছড়া—'কুঁড়ড়া, কাওয়ারী, মুর। /তিন নিয়ে মেদিনীপুর॥' আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে ব'লে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নদীয়ার চারটি ছড়া নিম্নরূপ—

তাঁতি, গোঁসাই, আচায্যি ঠাকুর।
এই তিন নিয়ে শান্তিপুর॥ (অন্যতম থানা-কেন্দ্র)

শান্তিপুর যে তাঁত-বস্ত্রশিল্পের এক প্রখ্যাত কেন্দ্র এবং বহু গোস্বামী-বংশের পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান সেকথা সুবিদিত। 'আচায্যি ঠাকুর' বলতে অদ্বৈত আচার্যকেই বোঝানো হয়েছে যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে মহাবিষ্ণু বা শিবের অবতার জ্ঞানে পূজিত। তাঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়েই, তাঁর ৫২ বছর বয়সে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন সেকথা 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে এভাবে বলা হয়েছে—

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥"

তাঁতি, গোঁসাই, পচা ভুর (ঝুরঝুরে গুড়)।
এই তিন নিয়ে শান্তিপুর॥

মুচি, মুখুজ্জো, কায়েত, বোঁচা।
এ চার নিয়ে মুড়োগাছা॥ (হাঁসখালি থানায়)

তেলী, তিলি, গানের হাট।
এ তিন নিয়ে রাণাঘাট॥ (অন্যতম মহকুমা-কেন্দ্র)

তেলী অর্থে কলু। কিন্তু তিলি নবশাখ সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ ব'লেছেন—

> প্রবাদ পরশুরাম যে ৯টি সেনাদলকে সমরসহায় করিয়া ২১ বার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সংগ্রামান্তে তাদের ৯ প্রকার বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ায় তারা নবশায়ক বলিয়া পরিচিত হয়। তারা হিন্দুর জাতিবৃক্ষের নয়টি শাখাস্বরূপ এক শ্রেণীভুক্ত ৯টি শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি। তিলি, মালাকার, তাম্বুলি, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমার, গন্ধবণিক ইহার অন্তর্গত।

রাণাঘাটে তেলী ও তিলি সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রাধান্য ছাড়াও একদা গান-বাজনার যথেষ্ট চর্চা ছিল।

কলকাতার দুটি ছড়ার পাঠ—

ময়রা, মুদি, কলাকার।
এ তিন নিয়ে বাগবাজার॥

কাক, কাঙালী, ভাট।
তিনে কালীঘাট॥

'চলন্তিকা'কার 'ভাট' কথাটির অর্থ করেছেন—"বংশপরিচয় দেওয়া যাহার ব্যবসায়।...একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ গৃহস্থবাড়ীর অনুষ্ঠানে তোষামোদ বা গুণগান করিয়া যাহারা কিছু বিদায়ী আদায় করে।"

বাংলাদেশের নোয়াখালির তিনটি ছড়াতে, সামান্য পার্থক্য সহ, উল্লেখ্য জনগোষ্ঠীগুলির কথাই প্রধানত বলা হয়েছে—

মোল্লা, মাঝি, কুলি।
তিনে নোয়াখালি॥

মক্তব, মৌলবী, কুলি।
তিনে নোয়াখালি॥

মোল্লা, মুনশী, আলি।
তিনে নোয়াখালি॥

শেষ ছড়ার 'আলি' শব্দটি সম্ভবত উক্ত পদবীধারী মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সূচিত করে।

চট্টগ্রামের এ-শ্রেণীর ছড়া পাওয়া গেছে একটি। তাতে 'পীর' ও 'দরগা'র উল্লেখ যথাযথ হলেও 'শুঁটকি'র অনুপ্রবেশ অবান্তর—

পীর, শুঁটকি, দরগা।
তিন নিয়ে চাটগাঁ॥

শ্রীহট্টের অতি-সংক্ষিপ্ত ছড়াটির সামাজিক তাৎপর্য কিন্তু বিলক্ষণ। সে-অঞ্চলে কন্যাপণ-প্রথা প্রচলিত। অর্থাৎ, বিবাহকালে পাত্রপক্ষের পাত্রীপক্ষকে পণ দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু, নীচের ছড়া অনুসারে, নবীগঞ্জ মহকুমার আগনা গ্রামে এই রীতি নাকি অনুসৃত হয় না। ছড়াটির পাঠ—

আগনা।
কন্যা দেয় মাগনা॥

এই বর্গের শেষ ছড়াটির স্থান ও তাতে উল্লিখিত ব্যক্তিবিশেষদের পরিচয় না জানা গেলেও সেটি উদ্ধৃত করছি এই বিশ্বাসে যে তার মর্মার্থ প্রায় সর্বত্রই প্রযোজ্য। বাঙালির পক্ষে বংশগত পেশা অবলম্বন করে থাকবার দিন আজ গত হয়েছে। যে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই অমোঘ অবস্থার সৃষ্টি, তা বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। তবু এটুকু হয়তো বলা যায়, একালের বাঙালির জীবনে সনাতন বৃত্তিগত অর্থোপার্জন-ব্যবস্থা এতদূর ভেঙে পড়েছে যে, বহুক্ষেত্রে জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে আর যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নেই। অধুনা নানা কলাকৌশলে যে-কেউ যেমন যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন তেমনি কোর্টের এফিডাভিটবলে পদবী পরিবর্তনও মামুলি ব্যাপার। এ-অবস্থায়, (জমিদারী প্রথা-বিলোপ আইন কার্যকর হবার পূর্বে) সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও ঘোর প্রজাপীড়ক ব্যক্তিও জমিদার হয়ে বসতে পারতেন। নীচের ছড়াটিতে সেরকম এক সামাজিক পরিস্থিতিই বিবৃত হয়েছে—

মেথর মিস্ত্রি হল,
পাটনী হল 'দাস'।
ত্রৈলোক্য বাড়ুজ্জ্যে জমিদার হল,
লোকের মাগ্যে (মার্গে) গেল বাঁশ॥

স্থান-বিবরণ বলতে অনেকে হয়তো আলোচ্য অঞ্চল বা জনপদের ভূপ্রকৃতিগত পরিচয়ের কথাই শুধু বোঝেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এই বিরাট বিষয়ের মাত্র একাংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। আরও বহু অংশের পরিচয়বাহী ছড়াও যে থাকতে পারে এবং আছেও প্রচুর সংখ্যায় তার খানিক প্রমাণ পূর্বগামী খ্যাতি-অখ্যাতি ও সমাজবিন্যাসমূলক অগণিত ছড়া। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে নূতনতর বিষয়ে অনুরূপ 'স্থান-বিবরণী' ছড়া আরও বহুসংখ্যায় উপস্থাপিত হবে। তবে একথাও ঠিক যে, আক্ষরিক অর্থে ভূপ্রকৃতিগত বিবরণসহ, বহু স্থানিক ছড়াও আছে। সেগুলিই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থের সূচনায় আমরা 'আইতে শাল (সাল), যাইতে শাল (স্যাল)।/

তার নাম (বা তারে কয়) বরিশাল ॥'—এই সুবিদিত ছড়াটির পর্যালোচনা করেছি যার তিন রকম ব্যাখ্যা সম্ভব। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' (২য় খণ্ড) 'শাল' কথাটির অন্যতম অর্থ করেছেন, "মর্মান্তিক দুঃখ ; ব্যথা" এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"যৌবনে মরণকাল, হৃদয়ে রহিল শাল, প্রবোধ পরাণে নাহি মানে।" এই অর্থে ছড়াটির স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হওয়া উচিত, বরিশালে যাওয়া-আসা এক কষ্টকর ব্যাপার। সকলেই জানেন, বরিশালে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। এখনও সে-জেলায় কোনও রেল-লাইন নেই ; অপ্রচুর রাস্তাঘাটে বা নদী-খালে বাস-ট্যাক্সি এবং স্টীমার-লঞ্চের আমদানিও বেশী দিনের নয়। সেজন্য সেখানে স্থানান্তরে যেতে বৈঠা-বাহিত ধীরগামী ছোট ছোট নৌকাই প্রধান অবলম্বন যাতে, ছড়ার ভাষায়, সময় লাগে এক-এক সাল বা বৎসর। আমাদের বিবেচনায় এ-দুটি ব্যাখ্যাই যথাযথ। কিন্তু কেউ-কেউ যে ছড়াটির মানে করেন, বরিশালবাসীরা অপরকে আসবার এবং যাবার সময় দু'বারই দুঃখ দিয়ে যান, তা অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিদ্বেষজাত বলেই মনে হয়। এই মীমাংসা অনুসারে, ছড়াটি ভূপ্রকৃতিগত বর্গে পড়ে। সে-শ্রেণীর ছড়ার মুখপাত্ররূপে এই বিশেষ দ্বিপদীটির নির্বাচনের কারণ সেটির মতো প্রায় সর্বজনবিদিত ছড়া আর নেই বললেই চলে।

ভূপ্রকৃতিগত ছড়ার সংজ্ঞার্থ এভাবে নির্ণয়ের পর, আমরা এবার সংগৃহীত উদাহরণগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি। অন্যান্য বর্গে অনুসৃত ক্রম অনুযায়ী আমরা এ-ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার বীরভূম-পুরুলিয়া (মানভূম)-বাঁকুড়া-বর্ধমান-হুগলি-হাওড়া-মেদিনীপুর-মালদহ-মুর্শিদাবাদ-নদীয়া-কলকাতা এবং বাংলা-দেশের মৈমনসিং-বরিশাল-শ্রীহট্ট—এই জেলাওয়ারি পরম্পরা অনুসরণ করব। দুঃখের কথা, দুই বাংলার অবশিষ্ট জেলাগুলি থেকে আমরা অনুরূপ ছড়ার কোনও নমুনা পাইনি।

বীরভূমের দুটি ছড়াই মূলত ভূপ্রকৃতিগত হলেও এমন মাধুর্যমণ্ডিত যে, গ্রন্থের শেষদিকে কাব্যধর্মী ছড়ার অধ্যায়ে তাদের পুনরুল্লেখ করব। ইলামবাজার থানার অধীন নান্দার এক অতি দুর্গম গ্রাম। খুব সংক্ষিপ্ত একটি ছড়ায় সে-দুর্গমতা কত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে দেখুন —

কতদূর নান্দার ?
—নান্দার যেতে আন্ধার ॥

মুরারই গ্রামে ঋতুভেদে জলবায়ুর প্রচণ্ড বৈষম্যমূলক দ্বিতীয় ছড়াটির সরল গ্রাম্য ভাষা যেমন স্বাদু, ছন্দ-ঐশ্বর্যও তেমনি মনোরম—

খরাতে কাঠফাটা,
বর্ষায় থইথই।
শীতকালে লেপের তলা,
—তবে জানবি মুরারই ॥ (অন্যতম থানা-সদর)

পুরুলিয়ার ছড়াটিতে অন্যতম থানা-সদর ঝালদা এবং তার অন্তর্গত আর-দুটি গ্রামের বৈশিষ্ট্যের (মুরগুমায় কংসাবতীতীরবর্তী এক উল্লেখ্য ঘাট, মহুদার মাটিতে এক বিরাট ফাটল ও ঝালদার প্রসিদ্ধ হাটের) কথা 'তিনের ছড়ার' ভঙ্গিতে বলা হয়েছে—

মুরগুমার ঘাট।
মহুদার ফাট।
ঝালদার হাট ॥

মানভূমের ছড়াটিতে আর-এক প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা বিবৃত—

মানভূমের মাটি।
চলবি গুটিগুটি ॥
চলবি যদি ধাঁয়ে (ধেয়ে)।
পড়বি আছাড় খাঁয়ে (খেয়ে) ॥

বাঁকুড়ার ছড়াটিতে জেলা-কেন্দ্র থেকে বহুদূরবর্তী থানা-সদর সিমলাপালে যাবার দুরূহতা উল্লিখিত—

বারো নদী, তেরো খাল।
তবে পাবি সিমলাপাল ॥

বর্ধমানের চারটি ছড়ার প্রথমটিতে দামোদরের শাখা-নদীগুলির উল্লেখের পর রাঢ়বঙ্গের এই 'কীর্তিনাশা'র বিধ্বংসী বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বিবৃত হয়েছে অন্যগুলিতে—

ক্ষুদে, নুনে, বরাকর।
তিন নিয়ে দামোদর ॥

দামোদরে এল বান।
ডুবল শহর বর্ধমান ॥

ওরে নন্দ দামোদর।
তোরে নিয়ে আতান্তর ॥

যত ধান তত বান।
দুয়ে মিলে বর্ধমান ॥

হুগলি-সংক্রান্ত একটি ছড়া এই অধ্যায়েরই পরবর্তী উপশ্রেণীতে দেখানো হয়েছে। হাওড়া থেকে প্রাপ্ত তিনটি ছড়ায় উল্লিখিত স্থানগুলি সবই বাগনান থানায়--

খানা, ডোবা, পুকুর।
তিন নিয়ে খানপুর।

খাল, নালা, বন্যা।
তিন নিয়ে খাল্না ॥

নাউপালার মাটি ॥
চলবে গুটিগুটি।
যাও যদি ছুটে।
মরবে কাঁটা ফুটে ॥

মেদিনীপুর থেকে এই পর্যায়ের কোনও ছড়া না পাওয়াটা গভীর পরিতাপের বিষয়। কেননা, আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলায় পুবে ভাগীরথী-রূপনারায়ণের পলিমাটিগঠিত শ্যামল তীরভূমি থেকে পশ্চিমে ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বিনপুর-জামবনী-গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার তরঙ্গায়িত, রুক্ষ, কাঁকুড়ে মাটি অবধি বিস্তীর্ণ ভূভাগের ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্য অসীম।

মালদহের একটিমাত্র ছড়ায় সেখানকার দুটি গ্রামে জলকষ্টের জন্য আহারাদির পর দূরের পুকুরে হাতমুখ ধুতে যাবার অসুবিধার কথা বলা হয়েছে—

চৈতা, মন্তাপুর,
মুখ চড়চড়,
পুকুর দূর ॥

জাপানী 'হাইকু'-কবিতার সঙ্গে গঠন ও ভাবগত সাদৃশ্যের কারণে এ-ছড়াটি গ্রন্থশেষের 'কাব্যধর্মী ছড়া'র অধ্যায়ে বিশদতর ভাবে আলোচিত হবে।

মুর্শিদাবাদের ছড়াটি পুরোগামী বাঁকুড়ার ছড়ার আঙ্গিকে রচিত—

বারো নদী, তেরো খাল।
তবে পাবি কুইলাপাল ।। (বড়েঞা থানায়)

নদীয়ার প্রথম ছড়াটিতে চাকদা থানার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরবর্তী শিমুরালির মহাশ্মশানের আভাস পাওয়া যায়—

বাঁশ, বন, মড়ার খুলি।
এ তিন নিয়ে শিমুরালি ।।

দ্বিতীয়টি একই থানার সুখসাগর গ্রামের মাটির উচ্চ প্রশংসায় মুখর—

কে বলে আমার গোপাল বোঁচা ?
সুখসাগরের মাটি এনে নাক করিব সোজা ।।

নীচের ছড়াটিতে বেহালার (অধুনা শহর কলকাতার অন্তঃপাতী) যে প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে তা যে বহুকাল আগেকার তাতে সন্দেহ নেই—

খানা, খন্দ, হোগলা।
তিন নিয়ে বেহালা ।।

পূর্ববাংলার মৈমনসিং-এর দুটি ছড়ার প্রথমটির এক পাঠান্তর আছে যা ঢাকার বাংলা একাডেমি কর্তৃক সংগৃহীত—

হাওড়, জঙ্গল, মইষের শিং।
এই তিন লইয়া মৈমনসিং ।।

পাঠান্তর, জমিদার, জঙ্গল, মইষের শিং।
এ তিন লইয়া মৈমনসিং ।।

অপর ছড়াটি হল—

নদী, চর, খাল, বিল, গজারীর বন।
টাঙ্গাইল-শাড়ি তার গরবের ধন।

বরিশালের নদীমাতৃক ভূপ্রকৃতি নীচের ছড়াগুলির প্রধান বিষয়বস্তু

নদী, বিল, খাল।
তিনে বরিশাল ।।

ধান, নদী, খাল।
তিনে বরিশাল ।।

অলিগলি চিপা (সংকীর্ণ) খাল।
এই লইয়া বরিশাল ।।

শ্রীহট্টের তিনটি ছড়ার প্রথম দুটিতে আলোচ্য স্থানগুলির মামুলি ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। শেষেরটির কাব্যিক মনোহারিত্বের জন্য সেটি গ্রন্থশেষের 'কাব্যধর্মী ছড়া' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। ছড়াগুলি এই—

বারো বাঁক, তেরো মুড়া (পাহাড়)।
তে (তবে) গিয়া পাইবাম (পাব) বেঁকামুড়া ॥

বদরজনি, নাহাপাড়া।
নাই পথ, নাই দাঁড়া (সংকীর্ণ খাল)।
যদি বা থাকে, তা কচুরিভরা ॥

পুঞ্জা (পুঞ্জ পুঞ্জ) ম্যাঘ আঞ্জাআঞ্জি (জড়াজড়ি)
চেরাপুঞ্জীর পাড়-অ (পারে)।
কালা ম্যাঘ (মেঘ) ফাল্ দি (লাফ দিয়ে) পড়ে
সাদা ম্যাঘর ঘাড়-অ (ঘাড়ে) ॥

ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত নীচের ছড়াটিও, জাপানী 'হাইকু' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য, 'কাব্যধর্মী ছড়া' অধ্যায়ে বিশদতরভাবে আলোচিত হবে—

হাতে লাঠি।
বনে ডর,
তেই (এভাবে) যাই কলাহর (কৈলাসশহর) ॥

আর-এক শ্রেণীর ভূপ্রকৃতিগত ছড়ায় বন্যাপ্লাবিত সন্নিহিত লোকালয়গুলির মধ্যে যেটি ডোবে না তার প্রশস্তি দেখা যায়। নিরাপদ গ্রামের অধিবাসীরাই হয়তো সেগুলির রচয়িতা। অনেকে মনে করবেন, তাঁদের এই ব্যবহার সামাজিক সম্প্রীতির পরিপন্থী। সে যাই হোক, এ-ছড়াগুলি থেকে বিশেষ বিশেষ ভূভাগের নতোন্নত ভূমির পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে সেগুলির জেলাওয়ারি উল্লেখ করছি। প্রথমে বীরভূম জেলা—

জয়কৃষ্ণপুর ডুবুডুবু, (বোলপুর থানায়)
খাড়গাঁ ভাসে। (মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানা-সদর)
সোনার গ্রাম বাগপাড়া, (নানুর থানায়, জয়কৃষ্ণপুরের কাছে)
চিলেয় (চিলেকোঠায়) ব'সে হাসে ॥

পাঠান্তর, পসুর ডুবুডুবু, (বোলপুর থানায়)
খাড়গাঁ ভাসে।

সোনার গ্রাম বাগপাড়া,
চিলেয় ব'সে হাসে ॥

পরের ছড়াটি বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানায় সন্নিহিত কয়েকটি গ্রাম সম্পর্কে—

কিষ্টনগর (কৃষ্ণনগর) ডুবুডুবু,
বেন্দা ভাসে।
সোনার পাত্তোসায়ের (পাত্রসায়ের)
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

নীচের ছড়া দুটি বর্ধমানের। প্রথমটিতে উল্লিখিত গ্রামগুলি পূর্বস্থলী ও দ্বিতীয়টির স্থানগুলি রায়না থানায় অবস্থিত।

পাটুলি ডুবুডুবু,
দামপাল ভাসে।
সোনার নারায়ণপুর
খিলখিলিয়ে হাসে ॥

মেড়াল, মুগরো, জগৎপুর
বানের জলে ভাসে।
সোনার মাদানগর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

হুগলি থেকে সংগৃহীত ছড়া মাত্র দুটি যা অপ্রত্যাশিত। নীচের ছড়াটিতে নদীয়ার শান্তিপুর এবং হুগলির বলাগড় থানার অধীন গুপ্তিপাড়া ও সোমড়া জনপদগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এগুলি সবই ভাগীরথীতীরবর্তী। কিন্তু হুগলির পশ্চিমাঞ্চলে মজা-দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতির বন্যায় প্রতি বৎসরই বিস্তীর্ণ এলাকা, বিশেষত খানাকুল এবং সন্নিহিত ভূভাগ, প্লাবিত হয়ে থাকে। সেখান থেকে এই শ্রেণীর বেশ কিছু ছড়া পাবো আশা করেছিলাম, পাইনি। সে যাই হোক, আলোচ্য প্রথম ছড়াটি এই—

শান্তিপুর ডুবুডুবু,
গুপ্তিপাড়া ভাসে।
সোনার সোমড়ার লোক
দেখে দেখে হাসে ॥

দ্বিতীয় ছড়ার প্রথম দুটি গ্রাম হরিপাল এবং তার পরের গ্রামটি সংলগ্ন তারকেশ্বর থানায় অবস্থিত—

গঙ্গা ডুবুডুবু,
ইটারাই ভাসে।
সোনার শিবপুর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে॥

মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত নীচের ছড়ায় উল্লিখিত সব কয়টি স্থানই বেলডাঙ্গা থানার অধীন এবং পরস্পর সন্নিহিত।

বিশুরপুকুর ডুবুডুবু,
মাধবপুর ভাসে।
বাঁশচাতর গেল গেল,
বেলডাঙ্গা হাসে॥

এই বর্গের শেষ ছড়া নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত কয়েকটি পল্লী সম্বন্ধে—

পাটকেবাড়ি ডুবুডুবু,
গলায়দ'ড়ে ভাসে।
সোনার বেকোয়াল আমার
বসে বসে হাসে॥

এসব ভূপ্রকৃতিগত ছড়ায় বিশেষ বিশেষ এলাকার স্থূল ভৌগোলিক পরিচয়ই শুধু মেলে। কিন্তু এক-একটি পল্লীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, ক্রমান্বয়ে প্রতিটি গৃহ, গৃহকর্তাদের পরিচয় বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য তাবৎ উল্লেখ্য বস্তুর বিবরণসংবলিত যেসব দীর্ঘ ছড়া একদা গ্রামগ্রামান্তরে প্রচলিত ছিল সেগুলির কথা অল্প লোকেই জানেন। সেসব গ্রাম্য ছড়াকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা অবশ্যই করা যায় না। তবু, আমাদের বক্তব্যের খেই ধরিয়ে দেবার জন্য, তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দুই বিঘা জমি' থেকে একটু উদ্ধৃতি হয়তো প্রাসঙ্গিক। সে-কবিতার লাঞ্ছিত নায়ক উপেনের, বহুদিন পরে ভিটায় প্রত্যাবর্তনের বর্ণনায়, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

দুই দিন পরে, দ্বিতীয় প্রহরে, প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথতলা করি বামে,

রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে,
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে ॥

এখন যেসব ছড়ার আলোচনা করব তার অজ্ঞাত ও বিস্মৃত রচয়িতারা পল্লী-বর্ণনায় একই রীতি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের রচনা অনেক বেশী পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সেজন্যই অতীতের নানাবিধ সামাজিক তথ্যে পূর্ণ। আমাদের সংগ্রহে এ-রকম কয়েকটি ছড়ার মধ্যে প্রথমটি হুগলি জেলার, তারকেশ্বর থানার, কেশবচক গ্রাম সম্পর্কে এবং আনুমানিক এক শ' বছর পূর্বে রচিত ব'লে প্রকাশ। স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায়, সরল-রেখাকার (linear) সে-পল্লীটির পূবপ্রান্তের হাটতলা থেকে পশ্চিমপ্রান্তের দামোদরের বাঁধ অবধি বাসিন্দাদের পরিচয় সেটিতে পর পর বিধৃত। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ অতীতে সত্যই সেখানকার অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘ ছড়াটি নিম্নরূপ—

হাটতলাতে বড্ড বালি।
তার ওদিকে রক্ষাকালী ॥
রক্ষাকালীর খ'ড়ো ঘর।
তার ওদিকে শশধর ॥
শশধরের ট্যাঁকে ঘড়ি।
তার ওদিকে বামুনবাড়ি ॥
বামুনবাড়ির খড়ের কুঁড়ো।
তার ওদিকে মোড়ল বুড়ো ॥
মোড়ল বুড়োর মাথা ন্যাড়া।
তার ওদিকে হেমা গ্যাঁড়া ॥
হেমা গ্যাঁড়ার ধানের পালুই (গাদা)।
তার ওদিকে গোপাল পাড়ুই ॥
গোপালের দুয়ারে আছে গর্ত।
তার ওদিকে প্রিয় দত্ত ॥
প্রিয় দত্তর লম্বা ছাতি।
তার ওদিকে রামু তাঁতি ॥
রামুর পাছায় আছে খোস।
তার ওদিকে রমেশ বোস ॥

রমেশ বোসের গালে গর্ত।
তার ওদিকে হেম দত্ত ॥
হেমের মায়ের চোখ কি কানা ?
তার ওদিকে রোগো জানা ॥
রোগো জানার সদাই কাশি।
তার ওদিকে গিরী পিসী ॥
গিরী পিসী বড় মন্দ।
তার ওদিকে ভোলা বন্দ্যো ॥
ভোলার দোরে পাঁঠার রক্ত।
তার ওদিকে পাঁচু দত্ত ॥
পাঁচু দত্তর খড়ের গাদা।
তার ওদিকে সরকার দাদা ॥
সরকার দাদার পায়ে খোস।
তার ওদিকে চিন্তা ঘোষ ॥
চিন্তা ঘোষের বড় ঘর।
তার ওদিকে নটবর ॥
নটবরের ভুলো কুকুর।
তার ওদিকে বামুনঠাকুর ॥
বামুনঠাকুরের নতুন হাঁড়ি।
তার ওদিকে চৌধুরীবাড়ি ॥
চৌধুরীবাড়ির তিন জ্ঞাতি।
তার ওদিকে বীরো তাঁতি ॥
বীরো তাঁতির ঘরে সিন্নী।
তার ওদিকে ডাক্তার-গিন্নী ॥
ডাক্তার-গিন্নীর দুই ভাই।
তার ওদিকে আর-কেউ নাই ॥

অগোছালো কথায়, ভাঙাচোরা ছন্দে রচিত এহেন গ্রাম-বিবরণী ছড়ার সাহিত্যমূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু সেকালের পল্লীজীবনের এমন বিস্তৃত ও নিখুঁত বর্ণনা যে বহুবিধ সামাজিক তথ্যের আকর তাতে সন্দেহ নেই।

হুগলির চণ্ডিতলা থানায় প্রসিদ্ধ জনপদ জনাই সম্পর্কে নীচের অনুরূপ ছড়াটি রেণুপদ মুখোপাধ্যায়ের 'সেকালের জনাই' গ্রন্থ (১৩৫৭) থেকে উদ্ধৃত।

জলাবাটীর দাপট বড়ো।
এগিয়ে গেলে হুলো হোরো॥
হুলো হোরো বেচে হাঁড়ি।
তার ওদিকে কর্তাবাড়ি॥
কর্তাবাড়ি সমাজ রাখে।
বাঁয়ে থাকে কেশব ভিটে॥
কেশব ভিটের মেজাজ ভারি।
পেরিয়ে এলেই গাঙ্গুলীবাড়ি॥
গাঙ্গুলীবাড়ি বিত্তের খনি।
সামনে থাকে রতনমণি॥
রতনমণির মুখ মিষ্টি।
সোজা গেলে বাঁড়ুজ্জো গুষ্টি॥
বাঁড়ুজ্জোগুষ্টি বিত্তের জাহাজ।
মোড় ফিরলে, মোড়ল বিরাজ॥
বিরাজমণির সরেস পিঠে।
দু'পা গেলেই আন্দী-ভিটে॥
আন্দী-ভিটে ভজে কালী।
সামনে গেলেই বনমালী॥
বনমালীর মেজাজ খাসা।
ডাইনে-বাঁয়ে মালীর বাসা॥
মালীর বাসাভরা সোলা।
পাশে থাকে ধর্মতলা॥
ধর্মতলার তিন পৈঠে।
তার ওদিকে বৈকুণ্ঠে॥
বৈকুণ্ঠের মা পরে শাড়ি।
উত্তরে আছে পরনোবাড়ি॥
পরনোবাড়ির মস্ত ঘটা।
সেথায় থাকেন কালীমাতা॥

কালীমাতার ভয়ে মরি ।
চলো এবার ভট্‌চাযবাড়ি ॥
ভট্‌চাযবাড়ি সমাজমণি ।
পেরিয়ে এলে দিনমণি ॥
দিনমণি মণির রাজা ।
সামনে আছে জগরাজা ॥
জগরাজার নতুন বাড়ি ।
দু'পা গেলে ময়রাবাড়ি ॥
ময়রাবাড়ি বেচে মিষ্টি ।
ওধারে আছে কুঁজো ষষ্ঠী ॥
ষষ্ঠীবুড়ির দৃষ্টি খর ।
বিনা পুজোয় ভুগে মরো ॥
ভুগলেই যাও তারকনাথ ।
সামনে বাবু কৈলাসনাথ ॥
কৈলাসনাথের খাসা বাড়ি ।
এগিয়ে গেলে টোলবাড়ি ॥
টোলবাড়ির দীননাথ ।
পণ্ডিত বটে উমানাথ ॥
উমানাথের দু'দিক ঘেঁষে ।
বিরাজ করে ফুলে-ভিটে ॥
ফুলেগুষ্টি কীর্তিমন্ত ।
নন্দ, পূর্ণ, চন্দ্রকান্ত ॥
চন্দ্রকান্তের কীর্তিগাথা ।
কে না জানে তার কথা ॥
কথায় কথায় কথা বাড়ে ।
চ'লে এসো দক্ষিণ ধারে ॥
দক্ষিণ ধারের সেরা বাড়ি ।
নামটি তার গোলাবাড়ি ॥
গোলাবাড়ির মস্ত ঠাট ।
গেয়ে গেছে দীনে ভাট ॥

দীনে ভাট বেচত লেবু।
বড় খদ্দের চণ্ডীবাবু ॥
চণ্ডীবাবুর মস্ত ঘোড়া।
সিধে গেলে বাজারপাড়া ॥
বাজারপাড়ায় বড্ড ভীড়।
ডাইনে বাস চক্রবীর ॥
চক্রবীরের মস্ত মান।
সামনে বাস গুপি দেওয়ান ॥
গুপির ছিল বড় গোলা।
বাঁ দিক ঘেঁষে কালীতলা ॥
কালীবাড়ির নাইকো অন্ত।
রশি গেলে বরদাকান্ত ॥
কান্তের বড় বরদামণি।
পাশে থাকে কমলধনি ॥
কমলধনির নাকের সিধে।
গেলেই পাবে সিমলী-ভিটে ॥
সিমলী-ভিটে গ্রামের শোভা।
নেমে এলেই নিমে ধোপা ॥
নিমে ধোপার মেজাজ ভারী।
সামনে আছে কংসবাড়ি ॥
কংসবাড়ির বেচাকেনা।
ব'সে শোনে মুচি সোনা ॥
মুচি সোনা চামড়া পেটে।
বাঁয়ে গেলে মুনশী-ভিটে ॥
মুনশী-ভিটে গাঁয়ের গোড়া।
সামনে থাকে ধোপাপাড়া ॥
ধোপাপাড়ার বাঁ দিক ঘেঁষে।
চলে গেলেই চট্ট-ভিটে ॥
চট্ট-ভিটের দানের কথা।
গেয়ে গেছে বিনে ধোপা ॥

বিনে কবি বেচত খড়।
সামনে শোভে নারাণগড় ॥
নারাণগড়ের নারাণবাবু।
পুরীর বাজার করল কাবু ॥
কথায় কথায় হল বেলা।
ফিরে এলেই মোধো পাগলা ॥
মোধো পাগলা বেচে কড়ি।
রশি গেলেই বাগানবাড়ি ॥
বাগানবাড়ির কর্তা যে জন।
প্রথম হয় পরে মোহন ॥
মোহন হল কুলের সেরা।
ডাইনে পড়ে বেনেপাড়া ॥
বেনেপাড়ায় বেচাকেনা।
সামনে শোভে হাওয়াখানা ॥
হাওয়াখানার মস্ত চুড়ো।
তার ওদিকে থানামুড়ো ॥
থানামুড়োর পাগল নন্দ।
যা করে নৈটীর বাবা পঞ্চানন্দ ॥

পুরোগামী দুটি ছড়ার প্রথমটি এক রৈখিক (linear) গ্রাম সম্পর্কে যেখানে প্রধান রাস্তার পাশে বাড়িগুলি পরপর অবস্থিত। ছড়াকার সেজন্য শুধু 'তার ওদিকে' কথা দুটি বারংবার ব্যবহার ক'রে সেগুলির সঠিক অবস্থান বোঝাতে পেরেছেন। গ্রামটিও ছোট; ১৯৬১ সালের আদমশুমার অনুসারে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৩৮। দ্বিতীয় ছড়াটি বহুদিকে ছড়ানো এক বিশালায়তন জনপদ (cluster village) সম্বন্ধে, ১৯৬১ সালে যার জনসংখ্যা ছিল ৬৩৩৭। সেজন্য সে-লোকালয়ের ভদ্রাসনগুলিকে চিহ্নিত করতে 'ডাইনে', 'বাঁয়ে', 'পাশে', 'ওধারে', 'সামনে', 'দক্ষিণে', 'সোজা গেলে', 'দু' পা গেলে', 'মোড় ফিরলে', 'রশি গেলে' প্রভৃতি নানা সংযোজক শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। প্রথম ছড়াটিতে একটিও দুর্বোধ্য কথা নেই। কিন্তু দ্বিতীয়টির কিছু শব্দ ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। যেমন, 'জলাবাটী' সম্ভবত প্রতিপত্তিশালী কোনও স্থানীয় পরিবারের দিঘিপরিবৃত বসতবাটির কথ্য-নাম। 'ভিটে' শব্দটি পারিবারিক পদবীর পরে

ব্যবহৃত হয়ে সে-পরিবারের বাস্তুভিটাকেই বুঝিয়েছে। 'ধর্মতলা' যে পল্লীর ধর্মঠাকুরের পূজা-স্থান ('থান') তাতে সন্দেহ নেই। 'পরনোবাড়ি' কোনও পুরানো বাড়ি বা 'পূর্ণ'-নামধারী কারও আবাস হতে পারে। 'কুঁজো ষষ্ঠী' অবশ্যই গ্রামের শিশুহিতকর দেবী যাঁর জাগ্রত খরদৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর পূজা না দেবার দুর্মতি হলে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তারকেশ্বরের শিব বাবা তারকনাথের শরণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। জরীপে ব্যবহৃত দূরত্বজ্ঞাপক 'রশি' শব্দটি ৫৫ গজের সমান। 'নারাণবাবুর পুরীর বাজার কাবু' করবার পিছনে বাস্তব ঘটনা থাকতে পারে। তিনি সম্ভবত ধনী বণিক্ ছিলেন এবং সেই সূত্রে একদা হয়তো পুরীতে খুব লাভজনক কারবার করে থাকবেন। 'মোধো পাগলা বেচে কড়ি' এই পঙ্‌ক্তি থেকে অনুমান, ছড়াটির রচনাকালে কেনাবেচার মাধ্যম ছিল কড়ি। 'নৈটীর বাবা পঞ্চানন্দ' হলেন জনাই-এর ৩ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত নৈটী গ্রামের প্রখ্যাত শিশুরক্ষক দেবতা। ভণিতার ভঙ্গিতে তাঁর শুভ নাম স্মরণ করে ছড়া শেষ করা হয়েছে।

হুগলির এ-দুটি ছড়া গ্রামাঞ্চলের লোকালয় সম্বন্ধে। শহর-এলাকায় অবস্থিত রিষড়া সম্পর্কে নীচের অসম্পূর্ণ ছড়াটির গঠনগত কোনও তারতম্য না থাকলেও বিবৃত বিষয়বস্তুর পার্থক্য লক্ষণীয়। রিষড়ার মধ্যবর্তী গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের দু'পাশের আংশিক বিবরণ সেটিতে লভ্য—

……সাধু খাঁয়ের চালের দোকান।
তার ওপাশে চায়ের দোকান ॥
পোস্টাপিসে ভাঙা খড়খড়ি।
তার ওপাশে পুলিশ-ফাঁড়ি ॥
তার পরে উড়িয়া-বস্তি।
পাশে ঘাট—নাম, কালী বক্সী ॥
উড়েদের মাথায় লম্বা চুল।
তার ওপাশে মাইনর স্কুল ॥
মাইনর স্কুল চারটেয় ছুটি।
তার ওপাশে সাহেবদের কুঠি ॥
সেই কুঠিতে খেলে বল।
তার ওপাশে হেস্টিংস-কল ॥……

হাওড়া জেলাতেও এই শ্রেণীর ছড়ার প্রচলন ছিল। পরবর্তী নিদর্শনটি

বাগনান থানার নবাসন (দক্ষিণপাড়া) সম্পর্কে জনৈক ভূষণ ঘোড়ুই কর্তৃক প্রায় ৮৫ বছর আগে রচিত ব'লে প্রকাশ—

অবিনাশ মাজী বড় ধনী।
তরকারিতে তেল খায়নি (খায় না)॥
সূর্য সাঁতরার বড় মান।
সে বলে, তেল কিনে আন॥
ভূষণ মোড়লের দাঁত-পড়া।
বলে, নিয়ে আয় বেগুন পোড়া॥
সাধন মোড়ল বামুনের হেলো।
তার ঘরেতে নাই কো আলো॥
বসন মোড়লের ছেঁড়া কাঁথা।
আহ্লাদী (আদরিণী স্ত্রী) বলে শুবো কোথা॥
নারাণ মোড়ল বড় মিস্তিরী।
তার ঘরে ভাত ছড়াছড়ি॥
ভূষণ ঘোড়ুই-এর গাড়ির আলো।
সবাই বলে—আছে ভালো॥

এখানেও একটু টীকা প্রয়োজন। 'হেলো' শব্দের অর্থ হালবাহক। 'ভূষণ ঘোড়ুই-এর গাড়ির আলো' কথাগুলির ব্যাখ্যা বেশ মজাদার। অধুনালুপ্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হাওড়া—খড়্গপুর শাখা খোলা হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যখন রেল-লাইন পাতা হয় আলোচ্য গ্রামটির একেবারে গা ঘেঁষে। রাত্রে প্রতি ট্রেনের সার্চ-লাইটের আলো বিশেষ করে ভূষণ ঘোড়ুই-এর কুটিরটিকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করত ব'লে এই ছত্র রচিত।

হাওড়ার একটি অনুরূপ ছড়া আংশিক সংগৃহীত হলেও এখানে গ্রন্থবদ্ধ থাকুক যাতে পরে কোনও গবেষক সেটিকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন—

…বালীর বাজারে বিকোয় হাঁড়া।
তার ওদিকে জেলেপাড়া॥
জেলেপাড়ায় শুকায় জাল।
তার ওদিকে বালী-খাল॥…

হুগলি ও হাওড়ার এই সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ ছড়াগুলি শুনে প্রখ্যাত ছড়াবিদ্ অন্নদাশংকর রায় একদা সেগুলিকে খাঁটি গ্রামীণ লক্ষণাক্রান্ত ব'লে মনে

করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও বিশ্বাস, "ভাঙাচোরা ছন্দে রচিত এই সকল ছড়ার মধ্যে অনেক প্রাচীন ইতিহাস, অনেক প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।···আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।"

পূর্ববর্তী ছড়াগুলিতে যেমন এক-একটি জনবসতির সন্নিহিত গৃহ বা গৃহস্বামীর বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি একই গোত্রের আর-একরকম ছড়ায় পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন গ্রামের কথা বলা হয়েছে। এ-জাতীয় ছড়া যে একদা আরও রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমরা কিন্তু মেদিনীপুর সংক্রান্ত নীচের ছড়াটিই শুধু সংগ্রহ করতে পেরেছি—

রামগড়ের রাজবাড়ি ভাঙ্গা।
তার ওপাশে আলমডাঙ্গা ॥
আলমডাঙ্গায় উঠল গোল।
তার ওপাশে কাদাসোল ॥
কাদাসোলে উঠল বাণী।
তার ওপাশে পিংবনী ॥
পিংবনীর বড্ড আড়ি।
তার ওপাশে গোরাবাড়ি ॥
গোরাবাড়িতে মারলে দৌড়।
তার ওপাশে গোয়ালতোড় ॥

রামগড় ও আলমডাঙ্গা বিনপুর থানায় এবং কাদাসোল, পিংবনী, গোরাবাড়ি ও গোয়ালতোড় সংলগ্ন পুবে গড়বেতা থানায় অবস্থিত। এসব গ্রামীণ ছড়ায় কত যে স্থানীয় তথ্য ছড়ানো আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেভুলানো ছড়া' নিবন্ধে যথার্থই বলেছেন—"আমাদের সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে।" তথাকথিত 'বাঙালীর ইতিহাস' নয়, যখন বাঙালির যথার্থ ইতিহাস রচিত হবে তখন এসব ছড়াগুলির হয়তো ডাক পড়বে।

ইতিহাস ও ধর্মভিত্তিক ছড়াগুলি একত্রে আলোচিত হওয়া উচিত যেহেতু শেষোক্ত শ্রেণীর দৃষ্টান্তগুলি বহুক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা

প্রথমে ইতিহাস ও তারপরে ধর্মসংক্রান্ত ছড়াগুলির আলোচনা করব। ইতঃপূর্বে এক বর্গের বহুসংখ্যক ছড়া থাকলে আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে যে জেলাওয়ারি ক্রম অনুসরণ করেছি, এখানে, উদাহরণের স্বল্পতার জন্য, সে-রীতিটি খুব কড়াকড়িভাবে অনুসৃত না হলে বিশেষ ক্ষতি নেই। প্রথম উদাহরণটি বীরভূমের নলহাটি থানার অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রাম (স্থানীয় কথ্য-উচ্চারণে 'ভাদুর') সম্বন্ধে—

ভাদুরের নন্দকুমার।
লক্ষ বামুন করলে শুমার (গণনা)॥
কেউ খেলে মাছের মুড়ো।
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো॥

মহারাজ নন্দকুমার রায় (১৭০৫ ?-১৭৭৫) একদা তাঁর পৈতৃক নিবাস ভদ্রপুরে অনুষ্ঠিত এক মহোৎসবে এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন। পেটুক নিমন্ত্রিতদের সেই বিরাট সমাবেশের একাংশে শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হলে বরকন্দাজরা বন্দুকের কুঁদো ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। সে-ঘটনা থেকে আলোচ্য ছড়াটির উৎপত্তি।

পলাশীর রণক্ষেত্র এখন নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানায় অবস্থিত। সে-যুদ্ধের ঘটনাবলী এতই সুবিদিত যে, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আঞ্চলিক ছড়াকারদের মুখে-মুখে-ফেরা সে করুণ কাহিনী নিম্নরূপ—

কি হল রে জান।
পলাশীর মাঠে নবাব হারাল পরাণ।
পলাশী-ময়দানে উড়ে কোম্পানি-নিশান॥

সিরাজদ্দৌলা অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হননি, হয়েছিলেন অন্যত্র। এ-ছড়ার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য না হলেও গ্রাম্য ছড়াকারদের ক্ষেত্রে এসব সামান্য ভুলত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হাওড়ার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত বাছরী গ্রামটি যে এক প্রাচীন প্রত্নস্থল তার আভাস নীচের ছড়াটি থেকে পাওয়া যায়—

বাছরীর মাটি।
হাঁটবে গুটিগুটি॥
যাবে যদি ছুটে।
খোলাম (খোলামকুচি) যাবে ফুটে॥

বাছরীর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে তারাপদ সাঁতরা রচিত ও বর্তমান গ্রন্থকা র

কর্তৃক সম্পাদিত 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি' (কলকাতা : ১৯৭৬) থেকে নীচের উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক—

(বাছরীর) স্থানীয় 'দমদমা'টি (ঢিপি) এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসাবে গণ্য। জনশ্রুতি, ঢিপিটি অতীতের কোন এক 'ফিঙ্গারাজা'র প্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপ। পাশের খাজুরী গ্রামে নাকি ছিল তাঁর কাছারি এবং তোষাখানা। একদা তিনি তাম্রলিপ্তের তাম্রধ্বজ-রাজাকে উপহারস্বরূপ যে মাছ পাঠান, তা তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তাম্রধ্বজ যুদ্ধে 'ফিঙ্গারাজা'কে পরাস্ত করে তাঁর প্রাসাদ বিধ্বস্ত করেন। কিংবদন্তী যাই হোক, গ্রামটির সর্বত্র অসংখ্য খোলামকুচির এবং সামান্য খননের ফলে পুষ্করিণী বা মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নানাপ্রকার মৃৎপাত্র দেখে স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হয়। অনুসন্ধানের ফলে এখানে যেসব ধূসর বর্ণের নল-লাগানো এবং অন্যবিধ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মৃৎপাত্রের নিকট সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব পুরাবস্তুর বহু নিদর্শন কলকাতার 'আশুতোষ মিউজিয়ম'-এ ও বাগনান-নবাসনের 'আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালা'য় রক্ষিত আছে। কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ, বিষ্ণুপট এবং মূর্তিস্থাপনের জন্য পাথরের পাদপীঠ প্রভৃতিও এখানে পাওয়া গিয়েছে। ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে সেগুলি খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের বলে মনে হয়। আদিম বঙ্গাক্ষরে পরপর তিন পঙ্‌ক্তিতে 'শ্রীবিশোক' কথাটি উৎকীর্ণ ও সীলমোহরযুক্ত পোড়ামাটির যে ছোট ফলকটি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা খ্রীষ্টীয় বারো শতকের বলে অনুমিত। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে মাটি খোঁড়ার সময় পোড়ামাটির বেড়যুক্ত দু'একটি পাতকুয়া এবং ছোট মাপের ইটের এক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। এসব পুরাবস্তুর নজীরে মনে হয়, প্রাচীন তাম্রলিপ্তের সমকালীন কোনও এক জনপদ হয়তো এখানে গড়ে উঠেছিল। স্থানটি সেজন্য অবশ্যই এক সম্ভাবনাময় প্রত্নক্ষেত্র।

হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত খানাকুল-রাধানগরনিবাসী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আগে, অন্য প্রসঙ্গে, যে খেউড়জাতীয় ছড়াটির উল্লেখ করেছি, তারও ইতিহাসগত পটভূমি আছে। এ-বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে (২য় সং : কলকাতা : ১৯৫৭ : পৃ. ৬৫-৬৯) লিখেছেন—

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এই প্রথা (সতীদাহ প্রথা) বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইলে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে, সহগমনার্থিনী বিধবাকে অগ্রে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোনও রাজকর্মচারীর নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে। এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্ব্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্রানুসারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন; এবং পূর্বোক্ত আবেদন পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদন পত্র গবর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজের লোকের তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবার একটি প্রধান কারণ হইল।

১৮২৫ সালের আন্দোলনের পুরাতন দলাদলিটা আবার পাকিয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল—দুই দলে আবার তর্কবিতর্ক চলিল। রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রিকা' সতীদাহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে রামমোহন রায়ের নামে গান বাঁধিয়া লোকে পথে পথে গাইত। সেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখে মুখে ঘুরিত। সেই সঙ্গীতের কিয়দংশ এই—

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী থানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল;
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিন কুল॥

এই সময়ে কলিকাতা-সমাজ যে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামমোহন রায়ের দলের প্রধান টাকীর

কালীনাথ রায়, (মুন্সী) মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার অনুচর ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুদলে রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় সমগ্র বড়লোক ছিলেন। ইঁহাদের কাহারও কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দিতেছি।....১৭৯৪ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয়।...১৮২৬ সালে তিনি সহরের সম্ভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।...রাধাকান্ত দেব লর্ড ক্লাইবের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত শোভাবাজারের রাজবংশসম্ভূত।....১৭৯৩ সালে তাঁহার জন্ম হয়। রামমোহন রায়ের ধর্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইঁহাকেই তাঁহাদের প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে বরণ করেন। তদ্ব্যতীত দেশহিতকর অপরাপর কার্য্যের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল।...১৮২৬ সালে কলিকাতা সহরে সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে অগ্রণী হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। পরে রাজসম্মানসূচক স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল হিন্দুসমাজপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।...রামকমল সেন সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ ১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।...তাঁহার সময়ে যে যে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল।...১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সুবর্ণ-বণিক কুলে মতিলাল শীলের জন্ম হয়।...১৮২৬ সালে তিনি সহরের একজন উন্নতিশীল ধনী ও নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া কলিকাতা সমাজকে মহা আন্দোলনক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন, ইংরাজী-শিক্ষা প্রচলন ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটি আলোচনার বিষয় ছিল; এবং স্কুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্ত্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। এই জন্য এই সকলের বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম।

এ-গ্রন্থের সূচনা-অংশে আমরা বলেছি, খুব কম ক্ষেত্রেই আলোচ্য ছড়াগুলির রচনাকাল বা রচয়িতার নাম জানা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত উক্তি থেকে সন্দেহ থাকে না, এই বিশেষ ছড়াটির প্রথম প্রচলনকাল ১৮২৫-২৬

সার। ছড়াটির বাঁধুনি, ছন্দ ও বিদ্রূপের ধরন থেকে এ-অনুমানও সঙ্গত যে, সেটি সমকালীন কোনও প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালের লেখা যাঁকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার মতো অর্থবল রাধাকান্ত দেব প্রমুখের যথেষ্টই ছিল।

আর-একটি ইতিহাসভিত্তিক ছড়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, এই কয়টি ছাড়া এ-জাতীয় ছড়া আর সংগ্রহ করা যায়নি। নিদর্শনের এই স্বল্পতা অপ্রত্যাশিত নয় যেহেতু স্থান-বিবরণী ছড়ার সংক্ষিপ্ত পরিসরে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ বর্ণনা অশিক্ষিত গ্রাম্য ছড়াকারদের কাছ থেকে আশা করাও যায় না। বর্তমান উদাহরণটি শ্রীহট্টের লংলা পরগণায় সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যার তারিখ ও বিচারের পরিণতি প্রভৃতি মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়। ছড়াটি অবশ্যই সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে রচিত ব'লে সেটির উদ্ভবকাল মোটামুটি সঠিকভাবে জানা সম্ভব কিন্তু রচয়িতা অজ্ঞাত। ছড়াটি এই—

লংলা গাঁইয়া বেটিনারে (গ্রাম-দুহিতারা)
উঁচায় বান্ধে খোঁপা।
লাঙের (উপপতির) লাগি সোয়ামী মাইর‍্যা
দ্যাশে রাখল খোঁটা (অখ্যাতি)।।

অর্থাৎ, মাথার উঁচুতে চুড়ো-খোঁপা বাঁধার অশালীনতায় অভ্যস্ত লংলা গ্রাম-দুহিতাদের একজন তার উপপতির জন্য স্বামীকে হত্যা করে দেশকে মসীলিপ্ত করল। এই সত্য ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১ম খণ্ড : পৃ. ১৬৬) গ্রন্থে বলা হয়েছে—

> কটু মিঞা লংলা পরগণার কানাইটিকরবাসী নজম্বর আলি চৌধুরীর কন্যা করিম-উন্নেসাকে বিবাহ করেন। এই রূপবতী রমণীর চরিত্রদোষ ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৭৭ সালের শ্রাবণ মাসে) কটু মিঞা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। করিম-উন্নেসা তখন পিত্রালয়েই ছিলেন। তিনি উপ-পতিগণের সহিত ষড়যন্ত্রক্রমে তাঁহাকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ তদীয় বাটীতে প্রেরণ করেন। 'কটু মিঞার গ্রাম্য গীতি'তে এই বিষাদাত্মক কাহিনী এখনও শুনা যায়। পরে এই বিষয়ে ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় শ্রীহট্টের তদানীন্তন জজ কবার্ণ সাহেবের আদেশে, করিম-উন্নেসা ও তাহার উপপতিত্রয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

শ্রীহট্টে ইহা এক ভয়াবহ, অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। এক সঙ্গে চারি ব্যক্তির (তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক) প্রাণদণ্ডের কথা ইতিপূর্বে শুনা যায় নাই।

উল্লিখিত ছড়াটি এবং 'কটু মিঞার গ্রাম্য গীতি' যে এ-ব্যাপারের অব্যবহিত পরের (১৮৭০-৭১ সালের) রচনা তাতে সন্দেহ নেই। রচয়িতার পরিচয় জানা না গেলেও, এই বিরল ক্ষেত্রে, ছড়াটির রচনাকাল সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়।

গ্রাম-বাংলার নানা প্রসঙ্গে সুখ্যাত মেহনতী-গবেষক শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হেটো বই হেটো ছড়া' গ্রন্থে (কলকাতা : ১৯২৬ : পৃ. ৫৫-৫৭) কিছু পাঠান্তর সহ একই ঘটনার নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন—

একদা স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের কাছে ছোট ছোট কেচ্ছার বইয়ের যথেষ্ট আদর ছিল। বহু বইয়ের কয়েকটি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। যেমন, 'ছহি বড় কটু মিঞা'। ইহা একটি বহুলপ্রচারিত প্রেমের গল্প। এ বইটির লেখক ও প্রকাশক হিসাবে একাধিক নাম পাওয়া যায়। সব বইকেই 'ছহি' অর্থাৎ আসল বই বলে জাহির করা হয়েছে। বাংলা ১৩২৪ সালে কলকাতা থেকে ছাপা হয়েছিল 'ছহি বড় কটু মিঞার কেচ্ছা', প্রণেতা সেখ কোমরদ্দিন সাহেব। ১৯২৬ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৩) ঢাকা থেকে ছাপা হয়েছিল 'ছহি বড় কটু মিঞা', লেখক মুন্সী মোহম্মদ আশ্রাফউদ্দিন সাহেব। দ্বিতীয় বইটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

লঙ্গনা নগরে ছিল নামে মজুমদার।
টাকা পয়সা ছিল ভাই তার বেশুমার ॥
নামেতে বহুত মানী তাহার আছিল।
নগরে তামাম লোক তাঁবেদার হইল ॥
চৌদিগে বৈঠকখানা দেখিতে বাহার।
কত শত বাগান আছে অতি চমৎকার ॥
এইরূপে কতদিন আনন্দেতে ছিল।
কর্পূলনেচ্ছা নামে এক বোটি ঘরে হইল ॥
রূপের মুরারী সেই বড়ই রূপসী।
মদনমোহন রূপ পূর্ণিমার শশী ॥…

এই বইয়ের শেষের কিছু অংশ হলো এই :

…ধীক ধীক পৃথিবীতে অভাগী জীবন।
কলঙ্ক রাখিয়া ভবে ঘটিল মরণ ॥

হায়রে কান্দিলে আর কি হবে এখন।
বাঁচিবার পন্থ নাই ধরিছে সমন ॥...
এইরূপে বিলাপিয়া কান্দে নেছাবতী।
তথায় আজ্ঞা প্রদান করিল বিচারপতি ॥
হাকিম হুকুম করে করিয়া বিচার।
কর্পূলনেচ্ছার তরে ফাঁসিতে দিবার ॥
বদি করিলে বদি ফলে প্রসঙ্গ ভারতী।
যেয়ছা মজা তেয়ছা সাজা পাইল নেছাবতী ॥...
কঠিন রমণী জাতি দুরান্ত ডাকিনী।
মুখেতে মধুর রস বুকে শেল হানি ॥
একি কলি বিষম কাল হৈল কলিকাল।
বুঝিয়া চলিবে সবে নারী হৈল কাল ॥
রমণীর বাক্য ভাই যে করে প্রত্যয়।
পুরুষ বলিয়া তারে কভু নাহি কয় ॥
নারীর কথায় কভু না কর বিশ্বাস।
কহে হীন আশ্রাফউদ্দিন সবাকার পাশ ॥

যে 'হেটো বই' থেকে উল্লিখিত পদ্যাংশ উদ্ধৃত, বীরেশ্বরবাবু, তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, সেটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬, দাম দু'আনা। তাঁর পুস্তকে এরকম বহু 'হেটো বই' বা 'হেটো ছড়া'র আলোচনা করতে হয়েছে বলে বীরেশ্বরবাবু স্থানাভাবে কবিতাটির শুধু প্রথম ও শেষাংশই উদ্ধৃত করতে পেরেছেন। তবু সন্দেহ থাকে না যে, স্বামীহত্যার দায়ে কর্পূলনেচ্ছার ফাঁসি হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৩) প্রকাশিত এ-বইয়ের 'লঙ্গনা নগর'বাসিনী 'কর্পূরলনেচ্ছা', কলকাতা থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'লংলা পরগণা'র 'করিম-উন্নিসা' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৭ সালে। প্রথম পুস্তকটি ঘটনার ৫৬ বছর ও দ্বিতীয়টি মাত্র ৪০ বছর পরে প্রকাশিত। এসব ব্যাপারে লোকস্মৃতি ক্রমশই ক্ষীণ হয় ব'লে প্রায় ১৬ বছর পূর্বে প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-এর বিবরণই অধিক গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া সে-গ্রন্থটি ইতিহাসের মানদণ্ড অনুযায়ী লেখা, 'হেটো বই'-এর মতো তাৎক্ষণিক রচনা নয়।

প্রসঙ্গত, 'কটু মিঞার কেচ্ছা'র মতো সমকালীন উত্তেজক সামাজিক ঘটনা

প্রভৃতি নিয়ে লেখা অজস্র 'হেটো বই' সেকালে ফেরি করে বিক্রি করা হত। ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মামলা, তারকেশ্বরের মহন্তের ব্যভিচারের কাহিনী, কলকাতার হাজার মজা, লাম্পট্যনিবারণ, মাদকবর্জন, এমন কি গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি বিষয়ে রচিত এসব অতি-সুলভ চটিবইয়ের কথা এখনও অনেকের মনে পড়বে। কিন্তু কোন-না-কোন স্থানভিত্তিক বাস্তব ঘটনা তাদের মূলে থাকলেও সেগুলি এত পল্লবিত ও রোমাঞ্চকরভাবে লেখা হত যে, সঙ্গত কারণেই, সেসব দীর্ঘ ছড়া বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূ'ত হয়নি। এ-বিষয়ে আগ্রহীরা অবশ্য বীরেশ্বরবাবুর উল্লিখিত গ্রন্থে প্রচুর তথ্য পাবেন।

আমাদের ধর্মস্থানগুলি সম্পর্কে যেসব ছড়া প্রচলিত তা প্রায়শ ইতিহাস-ভিত্তিক ব'লে সেগুলিকে বর্তমান অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করবার যৌক্তিকতার কথা আগেই বলেছি। এই শ্রেণীর অল্পসংখ্যক ছড়া কেবল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর, নদীয়া, কলকাতা ও ২৪-পরগণার নানা স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই জেলাওয়ারি ক্রম অনুসারে আমরা এখন সেগুলির আলোচনা করব। পুববাংলা থেকে এই বর্গের কোনও ছড়া পাওয়া যায়নি। প্রথমে কোচবিহার। সেখানকার ছড়াটি হল—

বলরামপুরের বাঁশ।
কোচবিহারের রাস ॥

বলরামপুর তুফানগঞ্জ থানার খুব বড় গ্রাম। সেখানকার বাঁশের বাস্তবিক প্রাচুর্য নয়, কোচবিহার শহরের বিখ্যাত রাস-উৎসবই এ-ছড়াটির উদ্দিষ্ট। সে-সম্পর্কে 'কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি' পুস্তকে (গ্রন্থনা : ড. শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ; সম্পাদনা : বর্তমান লেখক : কলিকাতা, ১৯২৬ : পৃ. ৪০-৪১) নিম্নলিখিত বিবরণ দেখা যায়।

> মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটি নির্মিত।....রাসপূর্ণিমার সময় প্রায় দশদিন ধ'রে সেখানে এক বিরাট উৎসব ও মেলা বসে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ-প্রবর্তিত এখানকার রাস-উৎসব উত্তরবঙ্গের লোকোৎসবগুলির মধ্যে বৃহত্তম বললে অত্যুক্তি হয় না।

পরবর্তী দুটি ছড়া বীরভূমের। সে-জেলায় অনেকগুলি পীঠ ও উপপীঠ থাকায় জেলাবাসীরা গর্বিত। প্রথম ছড়াটিতে সেই আত্মপ্রসাদ ও ছয়টি পীঠের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী, (অন্যতম থানা-সদর)
লাভপুরে মা ফুল্লরা। (ঐ)
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী, (ঐ)
তারাপীঠে মা জয়তারা ॥ (রামপুরহাট থানায়)
বোলপুরে কঙ্কালীতলা, (বোলপুর থানায়)
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা, (দুবরাজপুর থানায়)
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড় গলা ॥

এই পীঠগুলি সম্পর্কে দেবকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে (কলিকাতা : ১৯৭২) যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

বিষ্ণুচক্রকর্তিত সতীর দেহাংশের 'নলা' (কনুইয়ের নিম্নভাগ) পতিত হওয়ায় নলহাটীতে দেবী কালিকা এবং ভৈরব যোগীশ বিরাজ করিতেছেন।··· লাভপুরের পূর্বপ্রান্তে 'ফুল্লরা-মহাপীঠ'। সতীর ওষ্ঠ এখানে পতিত হয়। দেবীর নাম ফুল্লরা ও ভৈরবের নাম বিশ্বনাথ। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে 'সুরা' না দিলে দেবীর ভোগ হয় না।···সাঁইথিয়ায় ('পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' নন্দীপুর নামে খ্যাত) সতীর হার পতিত হয় ; দেবীর নাম নন্দিনী এবং ভৈরবের নাম নন্দীশ্বর।···প্রাচীন শাক্তপীঠ তারাপুর বর্তমানে তারাপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মহামুনি বশিষ্ঠদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই জনশ্রুতি অনুসারে তারাপীঠ সিদ্ধপীঠরূপেও গণ্য। বামাচরণ ওরফে 'বামাক্ষ্যাপা'ও এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। বর্তমান মন্দিরটি ১২২৫ বঙ্গাব্দে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে) মল্লারপুর নিবাসী দানশীল ব্যবসায়ী জগন্নাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।···কঙ্কালীতলা বোলপুর হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে কোপাই নদীতীরবর্তী বেঙ্গুটীয়া মৌজায় অবস্থিত। দেবী বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। দেবীর পতিত কঙ্কালস্পর্শে পুণ্যভূমির উপর সাম্প্রতিককালে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পার্শ্বে এক পবিত্র কুণ্ড। অনুসন্ধানে জানা যায়, বেঙ্গুটীয়া গ্রামেই আসল কঙ্কালীদেবীর পীঠস্থান অবস্থিত।···বক্রেশ্বরে সতীর দক্ষিণ বাহু পতিত হওয়ায় ইহা 'মহাপীঠ'রূপে গণ্য। দেবী বক্রেশ্বরী, ভৈরব বক্রেশ্বর।

বীরভূমের অপর ছড়াটিতে তিনটি স্থানের ধর্মীয় উৎসবের তুলনামূলক পরিচয় পাওয়া যায়—

মুলুকের অপরাজিতা, (বোলপুর থানায়)
মঙ্গলডিহির রাস। (ইলামবাজার থানায়)
ভুরকুণ্ডার ডেঙ্গো-ঠাকুর, (সিউড়ি থানায়)
শুনতে উপহাস ॥

অস্যার্থ, মুলুক গ্রামের বিখ্যাত অপরাজিতা দেবীর অর্চনা বা মঙ্গলডিহির সাড়ম্বর রাস-উৎসবের সঙ্গে আদিবাসী-গ্রাম ভুরকুণ্ডার ডেঙ্গো-ঠাকুরের সামান্য পূজার তুলনা উপহাসের মতো শোনায়।

পরের ছড়ায় পুরুলিয়ার তিনটি শৈবতীর্থের দেবতাদের গয়াধামের সুপ্রসিদ্ধ গদাধরের সঙ্গে সমমর্যাদার বলা হয়েছে। সন্দেহ নেই, এহেন অসম তুলনা উৎকট আঞ্চলিকতাপ্রীতির নিদর্শন—

বুধপুরের বুধেশ্বর। (মানবাজার থানায়)
আনাড়ার বাণেশ্বর। (পারা থানায়)
অযোধ্যার দামোদর। (বড়বাজার থানায়)
গয়াধামের গদাধর ॥

বাঁকুড়ার ছড়া তিনটি মোটামুটি স্বতঃবোধ্য—

হাজীপুর, গাজীপুর, মধ্যে খোলাখালী।
তার মধ্যে আছেন এক চামুণ্ডা-কালী ॥

উল্লিখিত গ্রামগুলি সবই জয়পুর থানার অন্তর্গত এবং এই কালীর খ্যাতি কাছাকাছি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বাঁকুড়ার দ্বিতীয় ছড়াটিতে কোনও বিশেষ স্থানের নাম বলা হয়নি ; তবে পূজার সাজে সজ্জিতা এ-রকম মনসাদেবী সে-জেলার যত্রতত্র দেখা যায়। ছড়াটি এই—

পাঁচমুড়ার হাতিঘোড়া,
পুরুলিয়ার 'লা' (লাক্ষাজাত আলতা)।
বিষ্ণুপুরের শাঁখা প'রে,
সেজেছেন মনসা মা ॥

তালডাংরা থানার পাঁচমুড়া গ্রাম পোড়ামাটির হাতিঘোড়ার (বিশেষত লম্বা-গলা ঘোড়ার) জন্য এখন জগদ্‌বিখ্যাত। পুরুলিয়ায় লাক্ষার চাষ প্রচুর এবং সে-উপাদান থেকে প্রস্তুত আলতাও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। আর, মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের শঙ্খশিল্পীদের খ্যাতি সুবিদিত।

বাঁকুড়া শহরে যে রথোৎসব ও মেলা হয় তা এমন কিছু প্রসিদ্ধ না হলেও স্থানীয় লোকের, বিশেষ ক'রে আদিবাসীদের কাছে, আদৃত। সে-জনপ্রিয়তার পরিচয় মেলে নীচের আদিবাসী-উৎসের ছড়াটিতে—

চল্ লো সই !
বাঁকুড়ার রথ দেখতে যাই ॥
তোদের হলুদমাখা গা।
তোরা রথ দেখতে যা ॥
আমরা হলুদ কুথায় পাব।
আমরা লেউটা (উলটা)-রথে যাব ॥

বর্ধমানের তিনটি ছড়া অগ্রদ্বীপ ও বাঘনাপাড়া সম্পর্কে—

নেড়ানেড়ী দোলে।
অগ্রদ্বীপের কোলে ॥ (কাটোয়া থানায়)

নেড়ানেড়ী বলতে মুণ্ডিতমস্তক বৈষ্ণব স্ত্রীপুরুষকে (বিশেষত প্রাক্তন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের) বোঝায়। বারুণীস্নানের মেলায় তাঁরা দলে দলে অগ্রদ্বীপে আসেন। এই প্রসঙ্গে, অমিয় বসু কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রাক্তন পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামের বহুমূল্য গ্রন্থ থেকে নীচের উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক।

> …ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে চারিশত বৎসরের অধিককাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ নামক এক বিগ্রহ আছেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর (তাঁর নির্দেশে) এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।…কথিত আছে যে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অন্তিমকালে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহাদের মধ্যে কে তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী হইবেন। ইহাতে ঘোষ ঠাকুর উত্তর দেন, গোপীনাথকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন, গোপীনাথই তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী। আজিও প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে (বারুণী-স্নান-তিথি) গোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রাদ্ধোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত করা হয়। বারুণী উপলক্ষে অগ্রদ্বীপে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ সাহেবধনী নামক সম্প্রদায়ের একটি উৎসবও প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবধনী নামক একজন ফকিরের দুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান শিষ্য মিলিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।

বর্ধমানের দ্বিতীয় ছড়াটিও অগ্রদ্বীপ সম্পর্কে—

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে।
মাণিকপীর দেওয়ান আছেন নগরীর হাটে॥

মাণিকপীর সম্ভবত সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও পীর। তৃতীয় ছড়াটি বাঘনাপাড়া সম্পর্কিত—

এখনও নেড়ীনেড়ায় আসে এই বাঘনাপাড়ায়। (কালনা থানায়)
আনন্দে নাচে গায় গাছের গোড়ায়।
কেন্থাকরোয়া (কাঁথা-কমণ্ডলু) সব তাদের গলায়॥

হুগলির তিনটি ছড়াই ভাগীরথীতীরবর্তী বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে। প্রথমটির অকুস্থল মাহেশ যেখানকার একমাসব্যাপী রথের মেলা ভারতবিখ্যাত। মাহেশের প্রাচীন ও সুউচ্চ মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। রথযাত্রার সময় এক বিরাট রথে ক'রে তাঁদের দু'মাইল দূরে রাধাবল্লভের মন্দিরে মহাসমারোহে নিয়ে যাওয়া হয় যখন রথের দড়ি টানতে বা যাত্রাপথের দু'পাশের মেলায় যোগ দিতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'দ্বাদশ গোপাল'-এর অন্যতম 'গোপাল' কমলাকর পিপলাইয়ের পাটও এখানে অবস্থিত। জগন্নাথ-মন্দির থেকে উৎসবের সময়ে তো বটেই, সারা বছরই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দেবতার ভোগ হিসাবে নিবেদিত ভাত, খিচুড়ি ও পায়েস সাধারণ্যে উচ্চ মর্যাদা পেয়ে নীচের লৌকিক ছড়াটিতে স্থান লাভ করেছে—

খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস।
এ তিন নিয়ে মাহেশ॥ (শ্রীরামপুর থানায়)

দ্বিতীয় ছড়াটিতে বংশবাটি বা বাঁশবেড়ের সংস্কৃতচর্চার খ্যাতি অথবা বিখ্যাত হংসেশ্বরী-মন্দিরের কোনও উল্লেখ নেই। আছে, কার্তিকপূজা, কাঁসা-শিল্প এবং উদগেড়ে, অর্থাৎ অলস অকর্মণ্যদের কথা। লৌকিক ছড়ার রচনা পদ্ধতিতে বহুক্ষেত্রে এ-রকমই দেখা যায়। যাই হোক, স্থানীয় কার্তিকপূজার মহা আড়ম্বর যে নীচের ছড়াটিতে উল্লিখিত হয়েছে সেটুকুই বর্তমানে আমাদের লক্ষণীয়। ছড়াটি এই—

কার্তিক, কাঁসারী, উদগেড়ে।
এ তিন নিয়ে বাঁশবেড়ে॥ (মগরা থানায়)

তৃতীয় ছড়াটি কিন্তু বংশবাটির যথার্থ বিবরণমূলক। সেখানে কোনও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ প্রক্ষিপ্ত হয়নি —

পরিপাটি বংশবাটি স্থান মনোহর।
যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর ॥
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস।
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বারো মাস ॥

মেদিনীপুর থেকে সংগৃহীত ছড়া মাত্র একটি হলেও সেটি প্রায়-অপরিচিত এক চিত্তাকর্ষক তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে। তার আঞ্চলিক খ্যাতি অবশ্য সমধিক কেননা সেটির বয়ান—

যা নাই ভাণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে)।
তা কেদার-কুণ্ডে ॥ (ডেবরা থানায়)

খড়্গপুর-ঝাড়গ্রাম রেলপথের মধ্যবর্তী স্টেশন বালিচক থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত এই কেদার গ্রামের কেদারেশ্বর শিবমন্দির সম্বন্ধে 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

কেদারেশ্বর 'ভুড়ভুড়ি কেদার' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে তৎপূর্ব হইতেই এখানে এই শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা যুগলকিশোর রায় নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের নির্মাতা বলিয়া কথিত। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি কুণ্ড হইতে সর্বদাই ভুড়ভুড় শব্দে বুদ্‌বুদ উঠে। এইজন্য শিবের নাম 'ভুড়ভুড়ি কেদার' হইয়াছে। সম্ভবতঃ নিকটস্থ কাঁসাই নদীর সহিত এই কুণ্ডের কোনরূপ যোগ থাকার জন্য এইরূপ জলবুদ্‌বুদ উঠিয়া থাকে। পৌষ-সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে সন্তান লাভ করা যায় এই বিশ্বাসে বহু নারী ঐ দিনে এখানে সমবেত হন এবং তদুপলক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে।

নদীয়ার চারটি ছড়ার প্রথমটি, প্রত্যাশিতভাবেই, নবদ্বীপ সম্বন্ধে। সেখানকার ধর্মীয় পরিবেশ গ্রামীণ ছড়াকারদের নম্র মানস ও সরল ভাষায় কিভাবে বিবৃত হয়েছে দেখুন—

কোষা, কুষি, চন্দনের টিপ।
এ তিন নিয়ে নবদ্বীপ ॥

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি, শাস্ত্রচর্চা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান নবদ্বীপ সম্পর্কে

প্রচুর গ্রন্থাদি আছে বলে, ভিন্ন বিষয়ে রচিত বর্তমান পুস্তকে সে-স্থানের বিস্তৃততর বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপশাখা 'সাহেবধনী' লোকধর্মের প্রধান কেন্দ্র, চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রাম (শ্রীপাট হুদা), সম্পর্কে নীচের ছড়াটি সেই সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য গীতিকার কুবিরচাঁদের রচিত বলে প্রকাশ।

ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদা গ্রাম।
যেথা দিবানিশি শুনিতে পাই দীনবন্ধু নাম॥

'সাহেবধনী'রা বিগ্রহপূজার বিরোধী এবং জাতিভেদহীন এক অখণ্ড সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে সমষ্টিগতভাবে পঙ্‌ক্তিভোজনে উৎসাহী।

'সাহেবধনী'দের সম্বন্ধে কুবিরচাঁদের আর-একটি ছড়া—

বৃন্দাবনের কর্তা যিনি।
রাইধনী এই নামটি শুনি॥
সেই ধনী এই সাহেবধনী।
জঙ্গীপুরে যার মোকাম॥ (মুর্শিদাবাদের অন্যতম থানা-সদর)

চৈতন্য-বৈষ্ণবধর্মের অপর উপশাখা 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র কল্যাণী থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়ায়। তাঁদের আরাধ্যা 'সতী-মা'র সমাধিতে তাঁর প্রতিকৃতি উপসিত হয়, দোল-পূর্ণিমার সময় এখানে সপ্তাহব্যাপী এক বড় মেলা বসে এবং অদূরের 'হিমসাগর দিঘি'র জলকে ভক্তরা সর্বরোগহর, বিশেষ করে অন্ধত্বনিবারক ব'লে বিশ্বাস করেন। এই সম্প্রদায়ের গীতিকার জাহ্নবিন্দুর লেখা নীচের ছড়াটি এই প্রসঙ্গে রচিত—

কত দাই এসে ঘোষপাড়ায়।
মায়ের কৃপাবলে অবহেলে মন্দ রোগ তাড়ায়॥
ডুবে হিমসাগরের শীতল জলে,
দূর হয়ে যায় আপদবালাই॥

কলকাতার দুটি ছড়া কালীঘাট এবং প্রতিমা নির্মাণের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র কুমারটুলি সম্পর্কে। প্রথমটি শ্লেষাত্মক ও দ্বিতীয়টি বর্ণনামূলক। দুর্বোধ্য কিছু নেই বলে সেগুলির ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রথমটি— কালির অক্ষর নাই কো পেটে।
চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥

আর দ্বিতীয়টি— রং, মাটি, তুলি।
তিনে কুমারটুলি।

২৪-পরগণার চারটি ছড়ার মধ্যে প্রথমটি সাগর থানার দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত কপিলমুনি-মন্দিরের সামনে সমুদ্রস্নানের মহাপুণ্য থাঁটি লৌকিক ছড়ার আঙ্গিকে অতি অল্প কথায় ব্যক্ত হয়েছে—

সব তীর্থ বারবার।
সাগরতীর্থ/গঙ্গাসাগর একবার ॥

পশ্চিমবাংলায় সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধির তীর্থক্ষেত্র এই একটিই। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের জন্য ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর থেকে কয়েক লক্ষ যাত্রী অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে এখানে সমবেত হন। সাগরতীর্থ সম্বন্ধে নীচের অপর ছড়াটি এক ব্রতকথার অংশ—

বাস করব নগরে।
মরব গিয়ে সাগরে ॥

তৃতীয় ছড়াটি প্রখ্যাত শাস্ত্রচর্চাকেন্দ্র ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া সম্পর্কে—

পাঁজি, পুঁথি, স্তোত্র পড়া।
এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া ॥ (জগদ্দল থানায়)

এ-ছড়ালেখকের বিদ্যার দৌড় আর-পাঁচজন গ্রাম্য কবির মতো হওয়ায় তিনি ভাটপাড়ার পণ্ডিতসমাজে অতি উচ্চ মার্গের সংস্কৃত ও শাস্ত্রচর্চাকে 'পাঁজি, পুঁথি, স্তোত্রপড়া'র থেকে বেশী কিছু ভাবতে পারেননি। সেজন্য, 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক—

> ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী অতি পুরাতন গ্রাম। ভাটপাড়া বাংলা দেশে সংস্কৃত-চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহা নানা শাস্ত্র-অধ্যাপক বহু পণ্ডিতের জন্মস্থান। ইঁহাদের মধ্যে নিমাই তর্কপঞ্চানন, হলধর তর্কচূড়ামণি, তারাচরণ তর্করত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, যদুরাম সার্বভৌম, শিবচন্দ্র সার্বভৌম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ভাটপাড়ার পণ্ডিত-মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় মতামত সমগ্র বঙ্গে সম্মানিত।

২৪-পরগণার চতুর্থ ছড়াটি খড়দহ থানার অন্তর্গত বিখ্যাত বৈষ্ণব-কেন্দ্র পানিহাটি সম্পর্কে। খুব কম ক্ষেত্রেই এসব স্থান-বিবরণী ছড়ার রচনাকাল বা রচয়িতার নাম জানা যায় ব'লে এটি বিরল জাতের, যেহেতু প্রায় চারশ' বছর আগে লিখিত জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থে এটির উল্লেখ আছে—

পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা-মন্দিরে॥

অর্থাৎ, পতাকাশোভিত বহু মন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ সব বৈষ্ণব-সমাজ (বা সংস্থা) এখানে অবস্থিত। স্থানটি শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ পারিষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট নামেও খ্যাত। গঙ্গাতীরে যে সুপ্রাচীন ঘাটটির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায় সেখানে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরী থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে, চৈতন্যদেব অবতরণ করেছিলেন ব'লে জনশ্রুতি। এখানকার আর-এক পুরাসম্পদ প্রায় সাতশ' বছরের পুরানো এক বটগাছ, যার নীচে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ একদা নাকি বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে চৈতন্যের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। আজও জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে অনুষ্ঠিত এক মহোৎসবে দেশ-বিদেশের বৈষ্ণবরা যোগ দেন। শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিপূত এহেন স্থানে বহু বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব প্রত্যাশিত!

ইতিহাসভিত্তিক ও ধর্মস্থান সংক্রান্ত স্থান-বিবরণী ছড়ার এ-অধ্যায়টি এখানেই শেষ হল। দুঃখের কথা, পূববাংলার কোনও ছড়া এখানে উল্লিখিত হয়নি। অথচ, ইতিহাসখ্যাত পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতী; হিন্দুতীর্থ সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ, মেহার, লাঙ্গলবন্ধ ইত্যাদি, অসংখ্য পীর-ফকির-দরবেশের স্মৃতিপূত দরগা প্রভৃতি সম্বন্ধে কত ছড়াই না প্রত্যাশিত ছিল! দুই বাংলার সুবিশাল স্থান-বিবরণী ছড়াভাণ্ডার থেকে দৃষ্টান্ত আহরণের জন্য একক প্রচেষ্টায় যে-পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন। পরবর্তী মেহনতী গবেষকরা হয়তো এ-অভাব পূরণ করবেন। বর্তমান গ্রন্থ এ-বিষয়ে পথিকৃতের দায়িত্ব কিছুটা পালন ক'রে থাকলেই যথেষ্ট।

এ-গ্রন্থের সূচনায় আমরা বলেছি, যে-সব লক্ষণের বিচারে রবীন্দ্রনাথ "আমাদের মাতা-মাতামহী, আমাদের স্ত্রী-কন্যা-সহোদরাদের কোমল হৃদয়পালিত, মধুর কণ্ঠলালিত" 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'ঘুমপাড়ানি গান'গুলিকে উচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, সেসব লক্ষণ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, স্থান-বিবরণী ছড়াতেও বিদ্যমান। প্রত্যাশিতভাবেই সংখ্যায় তারা বেশী নয় যেহেতু আলোচিত ছড়াগুলি প্রায়শই কোন-না-কোন প্রকার বিবরণমূলক যেখানে কাব্যধর্মিতার অবকাশ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টীকা সহ, কয়েকটি কাব্যগুণান্বিত

ছড়া সেখানে উল্লিখিত হয়েছিল। এ-পুস্তকের অন্যত্রও, ভিন্ন প্রসঙ্গে, আর-কিছু অনুরূপ ছড়া ব্যাখ্যাসমেত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের উপসংহারকালে ছড়ানো-ছিটানো এই সুললিত ছড়াগুলিকে একত্র বিন্যস্ত করবার প্রয়োজন অনুভব করছি যাতে সেগুলির সামগ্রিক সাহিত্যমূল্য নিরূপণ করা সহজ হয়। এহেন পূর্বোল্লিখিত ছড়ার সংখ্যা ছয়টি যেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে ব'লে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠক সে-টীকাগুলি যথাস্থানে দেখে নিতে পারবেন। সংক্ষেপে, নীচের ছয়টি কাব্যধর্মী ছড়া, যথাক্রমে, চেরাপুঞ্জীর আকাশে সাদা-কালো মেঘের খেলা, বাংলার পশ্চিম প্রত্যন্তসীমাবাসিনীদের আচার-ব্যবহার, বীরভূমের দুটি গ্রাম—মুরারই ও নান্দার-এর ভূপ্রকৃতিগত বিবরণ, বাঁকুড়ার তিনটি সংস্কৃতিমনা জমিদার-বংশের পতনের কাহিনী এবং পুরুলিয়ার মনোরম-সারল্যের একটি নিদর্শন সম্পর্কে। এই ক্রম অনুযায়ী সেগুলির বয়ান নিম্নরূপ—

পুঞ্জা ম্যাঘ আঞ্জাআঞ্জি চেরাপুঞ্জীর পাড়-অ।
কালা ম্যাঘ ফাল্ দি পড়ে সাদা ম্যাঘর ঘাড়-অ ॥

ছিঁড়া জালে মাছ ধরে ধলভূম্যানী।
চুন-দকৃতায় ভুলাই রাখে চিল্কিগড়্যানী ॥
ঘরে ভাত নাই, পান খায় ঝাড়গাঁগড়্যানী।
উচ্‌কপালে সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ানী ॥

খরাতে কাঠফাটা,
বর্ষায় থইথই।
শীতকালে লেপের তলা,
তবে জানবি মুরারই ॥

কতদূর নান্দার ?
—নান্দার যেতে আন্ধার।

অম্বিকানগর গেছে গানে।
খাতড়া গেছে দানে।
রাইপুর গেছে বানে ॥

শালিক, চড়াই, টিয়া।
বাস বামুনদিয়া ॥

এগুলির সঙ্গে আরও তিনটি ছড়া যোগ করা যেতে পারে যেগুলি পূর্বে, প্রসঙ্গান্তরে, উল্লিখিত হলেও তাদের কাব্যগুণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয়নি—

উলোর মেয়ের কুলকুলুটি,
ন'দের মেয়ের খোঁপা।
শান্তিপুরে নথনাড়া দেয়,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

কলকাতার মাথাঘষা,
খিদিরপুরের চিরুনি।
নোটন-খোঁপা বেঁধে দেব,
বেলফুলের গাঁথুনি ॥

চিতল মাছের কোল।
আর শান্তিপুরের বোল ॥

তিনটি ছড়ারই ছন্দের বাঁধুনি ও অন্ত্য-মিলের সৌকর্য লক্ষণীয়। নারী-জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম দুটি ছড়ার মোলায়েম শব্দসম্ভারও সুপ্রযুক্ত। তৃতীয়টিতে শান্তিপুরের সুমিষ্ট কথ্যভাষার প্রশংসায় যে-উপমাটির প্রয়োগ করা হয়েছে তা, অন্তত বর্তমান বা প্রাক্তন পূর্ববঙ্গবাসীদের কাছে, খুবই চিত্তাকর্ষক হবার কথা। বস্তুত, এত সংক্ষেপে এমন যথাযথ উপমা-প্রয়োগের নিদর্শন স্থান-বিবরণী ছড়ায় বড় একটা দেখা যায় না। তার থেকেও বড় কথা, কাব্যধর্মী ছড়াগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্ততমগুলিরই যেন চিত্রকল্প সৃজনের ক্ষমতা সর্বাধিক। যেমন, নান্দার গ্রামের দুর্গমতা মাত্র পাঁচটি শব্দে প্রকাশিত—'কতদূর নান্দার?/নান্দার যেতে আন্ধার'। এরকম চিত্রকল্প সৃজনকারী অতি-হ্রস্ব ছড়া আরও দু'চারটি আছে যেগুলির আলোচনায় এখন অবতীর্ণ হতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে অল্প-কথায়-লেখা জাপানী 'হাইকু' কবিতার প্রসঙ্গে বলেছেন—

জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণ-শক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না।

শরীরমনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়তে দেয় না। এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এপর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সেইজন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস! আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতেই বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে; তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

আর-একটা কবিতা :

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

আর বেশি না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে

গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।…যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

অল্প-কথায়-বলা মাত্র তিন লাইনের চিত্রধর্মী কবিতা আমাদের অজ্ঞাত, অখ্যাত, অশিক্ষিত গ্রাম্য ছড়াকাররাও কিছু কিছু লিখেছেন যেগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। থাকলে, এ-জাতীয় কবিতা আমরা যখন দুটির বেশী সংগ্রহ করতে পারিনি তখন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমশ্রেণীর আরও অনেক ছড়া তাঁর ইচ্ছা প্রকাশমাত্রই বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে জমা পড়তে পারত। কিন্তু তা হয়নি। না হবার কারণ তিনি স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন তাঁর সুবিদিত 'ঐকতান' কবিতায় যেখানে তিনি বলেছেন, ওপর-তলার বাতায়নের ধারে বসে তিনি নীচের দিকে কখনও কখনও তাকিয়েছেন বটে কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ব্যাপক সংস্পর্শে আসতে পারেননি। তবু 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'ঘুমপাড়ানি গান'-এর বহুপ্রসারী অনুশীলনকালেও তিনি কেন যে এসব অতি-হ্রস্ব বাংলা ছড়ার একটিরও নাগাল পাননি তা জানি না। বাংলার গ্রামেগঞ্জে অশিক্ষিত পল্লী-কবিদের দ্বারা (যাঁরা জাপানী 'হাইকু' কবিতার নামগন্ধও জানতেন না) রচিত এসব সংক্ষিপ্ত চিত্রধর্মী ছড়ার কথা জানলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লিখতেন না "তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই।" সে যাই হোক, আমাদের সংগৃহীত ছড়া দুটির প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। প্রথমটি মালদহ জেলার সদর থানার চৈতা ও মন্তাপুর নামের সন্নিহিত দুটি গ্রাম সম্পর্কে। সেখানে বড় জলকষ্ট। কুয়ো নেই, পুকুর যা আছে তা বেশ দূরে। আহারাদির পর পল্লীবাসী বা অতিথিদের শুকনো এঁটো মুখ-হাত ধুতে যেতে হয় সেই দূরবর্তী জলাশয়ে। সে-দুর্দশা নীচের ছড়াটিতে কী অপরূপ চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছে দেখুন।

চৈতা, মন্তাপুর,
মুখ চড়চড়,
পুকুর দূর ॥

দ্বিতীয় উদাহরণটি ত্রিপুরা অঞ্চলের, যেখানকার সমৃদ্ধ জনপদ কৈলাসশহরকে স্থানীয় কথ্যভাষায় বলা হয় 'কলাহর'। সেখানে যাবার পথে শ্বাপদসংকুল অরণ্য। সেজন্য হাতে অন্তত একটি লাঠি থাকা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতি নীচের ছড়াটিতে এক দৃশ্যকাব্যে পরিণত হয়েছে।

হাতে লাঠি,
বনে ডর,
তেই (এভাবে) যাই কলাহর ॥

আমাদের বিবেচনায়, এ-ছড়াগুলি জাপানী 'হাইকু' কবিতার থেকেও এক-কাঠি সরেস। কেননা, সংক্ষিপ্ততা ও চিত্রধর্মিতায় সমপদবাচ্য হওয়া ছাড়াও এগুলিতে গদ্যে রচিত পরপর তিনটি পঙ্‌ক্তির মামুলি সন্নিবেশের বদলে অন্ত্য-মিলযুক্ত ছড়ার আঙ্গিকও ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আজ নেই। জীবদ্দশায় আরও অধিক সংখ্যায় এই অসামান্য ছড়াগুলির সন্ধান পেলে, যে যত্ন ও মমতায় 'ছেলেভুলানো ছড়া' ও 'ঘুমপাড়ানি গান'গুলিকে তিনি অত্যুচ্চ সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, এগুলির ক্ষেত্রেও যে তা-ই করতেন তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর অবর্তমানে আমার মতো এক নগণ্য গবেষকের পক্ষে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের গ্রামপথের ধূলিমলিন এই মণিমুক্তাগুলি তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করে নীরব হওয়াই শ্রেয়। আর-কোনও যোগ্যতর উপায়ে বর্তমান গ্রন্থের উপসংহার করা যেতে কিনা সন্দেহ।

প রি শি ষ্ট

মূল গ্রন্থে উল্লিখিত অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছড়া আছে যা বিবরণমূলক নয় কিন্তু বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। কোনও-প্রকার বর্ণনাধর্মী নয় ব'লে সেগুলি মূল পুস্তকের পরিবর্তে বর্তমান পরিশিষ্টে আলোচিত হওয়াই সমীচীন। যেমন, অঞ্চলবিশেষে গ্রাম-নামের কিছু কিছু অন্ত্য-পদের ('পুর', 'গঞ্জ' প্রভৃতি) আপেক্ষিক প্রাচুর্য বিষয়ে নীচের ছড়াটি এক প্রাসঙ্গিক উদাহরণ—

'কাটা', 'মারি', 'গুড়ি'।
তিনে জলপাইগুড়ি॥

পূর্বে ব্যাখ্যাত 'তিনের ছড়া'র আঙ্গিকে রচিত এ-দ্বিপদীটির অর্থ—'কাটা,' 'মারি' ও 'গুড়ি' এই তিন অন্ত্য-পদযুক্ত পল্লী-নাম জলপাইগুড়ি জেলায় এত সুপ্রচুর যে, অনুরূপ অভিধার স্থানেই সে-জেলা যেন পূর্ণ। অন্যান্য এলাকায় পৃথক সব অন্ত্য-পদেরও আধিক্য দেখা যায় যা পরে, পর্যায়ক্রমে, উত্থাপিত হবে।

উপরের ছড়াটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার বক্তব্য আংশিক সত্য বললেও কম বলা হয়। উল্লিখিত তিনটি অন্ত্য-পদযুক্ত অনেক স্থান-নাম জলপাইগুড়ি জেলায় আছে বটে কিন্তু লোকালয়ের অনুরূপ অভিধা অপরাপর বেশ কিছু জেলাতেও লভ্য, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর সংখ্যায় বর্তমান।

এখানে পাঠকের সুবিধার জন্য একটি কথা ব'লে রাখা দরকার। অতঃপর জেলাওয়ারি-উল্লিখিত স্থান-নামগুলির পরে, প্রয়োজনে, বন্ধনীর মধ্যে, সংশ্লিষ্ট থানার নামও দেখানো হবে যাতে সেগুলির সঠিক অবস্থান-নির্ণয় সম্ভব হয়। যেমন, কোচবিহারের শোলমারি (দিনহাটা) বলতে বোঝাবে শোলমারি লোকালয়টি কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানায় অবস্থিত।

এবার আলোচ্য ছড়াটির প্রসঙ্গে আসা যাক। জলপাইগুড়ি জেলায় 'কাটা'-অন্ত গ্রাম-নাম আছে মাত্র ৪টি যাকে সুপ্রচুর বলা যায় না। দৃষ্টান্তগুলি হল, আমবাড়ি-ফালাকাটা (রাজগঞ্জ), গৈরকাটা (ধূপগুড়ি), চেচাকাটা (আলিপুর-দুয়ার) ও পাটকাটা (জলপাইগুড়ি)। অন্যান্য ৪টি জেলায়—কোচবিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে—অনুরূপ অন্ত্য-গঠনের গ্রাম-নাম দেখা যায়,

বর্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে যেগুলির নামোল্লেখ বা অবস্থান-নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই। লক্ষণীয় শুধু এইটুকু যে, পশ্চিমবাংলায় এই শ্রেণীর মোট ৮টি পল্লীর মধ্যে মাত্র ৪টির অন্তর্ভুক্তির জন্য জলপাইগুড়িকে সংশ্লিষ্ট ছড়ায় আরোপিত মর্যাদা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এ-রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রত্যন্তসীমায় অবস্থিত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ২৪-পরগণাতেও এই গঠনের নামের উপস্থিতি তাদের বহুদূরব্যাপী অস্তিত্বই সূচিত করে।

'মারি'-অন্ত গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির অবস্থা আরও শোচনীয়। পশ্চিমবাংলায় এই গড়নের মোট ৪৩টি নামের জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর-১৬, কোচবিহার-১৪, মুর্শিদাবাদ-৪, মালদহ-৩, জলপাইগুড়ি ও ২৪-পরগণা-২ ক'রে এবং দার্জিলিং ও বর্ধমান-১ ক'রে। জলপাইগুড়ির গ্রাম দুটির নাম—বোয়াল-মারি (জলপাইগুড়ি) ও পুঁটিমারি (আলিপুরদুয়ার)। শুধু তাদের ক্ষীণ সহায়তায় ছড়ার মস্ত দাবি সমর্থিত হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে 'গুড়ি'-অন্ত ৩৪টি স্থান-নামের জেলানুক্রমিক অংশ—জলপাইগুড়ি-১০, মেদিনীপুর-১০, কোচবিহার-৭, পুরুলিয়া ও বর্ধমান-২ ক'রে এবং দার্জিলিং, হুগলি ও নদীয়া-১ ক'রে। জলপাইগুড়ির ১০টি লোকালয়ের নাম—আমগুড়ি (ময়নাগুড়ি), উত্তর কামাখ্যাগুড়ি (কুমারগ্রাম), জলপাইগুড়ি, (জলপাইগুড়ি), তালেশ্বরগুড়ি (আলিপুরদুয়ার), ধূপগুড়ি (ধূপগুড়ি), বিন্নাগুড়ি (রাজগঞ্জ), বৈরীগুড়ি (জলপাইগুড়ি), ময়নাগুড়ি (ময়নাগুড়ি), শিমুলগুড়ি (রাজগঞ্জ) ও সন্তাগুড়ি (মাল)। এক্ষেত্রে, তুলনায়, অবস্থা অনেকটা ভালো হলেও মেদিনী-পুরের অংশ কিন্তু সমান-সমান এবং কোচবিহারও বেশী পিছে নয়। সেজন্য এখানেও জলপাইগুড়ির একাধিপত্য প্রমাণিত হয় না।

আলোচ্য ছড়াটির এত বিশদ বিশ্লেষণের কারণ আছে। কিছু কিছু গবেষক ছড়ার বক্তব্যমাত্রকেই ধ্রুবসত্য জ্ঞান করেন যা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। সেকালের যোগাযোগ ও পর্যটনব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য ছড়াকারেরা অবিভক্ত বাংলার দূরদূরান্তরের খবর অল্পই রাখতে পারতেন, যে কারণে সেগুলিকে, বিশেষভাবে এই শ্রেণীর ছড়াগুলিকে, অল্পবিস্তর যাচাই ক'রে নেওয়া উচিত।

একই বর্গের পরবর্তী ছড়াটি মেদিনীপুরের তমলুক-এলাকা সংক্রান্ত—

বারো 'বসান', তেরো 'দা'।
যে বলতে পারে সে তমলুকের ছা॥

কিছুটা হেঁয়ালির ধরনে উপস্থাপিত এ-ছড়াটির অর্থ, তমলুক-অঞ্চলে 'বসান'

ও 'দা' অন্ত্য-পদযুক্ত বহু গ্রামের অবস্থিতির জন্য সেখানকার যে কোন অধিবাসীর পক্ষে 'বসান'-অন্ত ১২টি এবং 'দা'-অন্ত ১৩টি স্থান-নামের উল্লেখ করতে পারা অবশ্যই উচিত। বিচার ক'রে দেখা যাক দাবিটি কতদূর বাস্তবসম্মত।

আশ্চর্য শোনালেও কথাটা সত্যি যে, পশ্চিমবাংলায় 'বসান'-অন্ত স্থান-নাম আছে মোট ২১টি যার সবগুলিই মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। অন্য কোনও অন্ত্য-পদের ক্ষেত্রে, একই জেলায় সংশ্লিষ্ট গ্রামের এত ঘন-সন্নিবেশ দেখা যায় না। সে যাই হোক, এখন আমাদের কর্তব্য, তমলুকের সন্নিহিত এলাকায় অন্তত ১২টি 'বসান'-অন্ত গ্রাম-নাম আছে কিনা তা যাচাই ক'রে দেখা। নীচের তালিকায় তমলুক থেকে বেশী দূরে নয় এমন ১০টি থানায় (মোটামুটি উত্তর থেকে দক্ষিণবর্তী) প্রাথিত পল্লী-অভিধাগুলির পরে, বন্ধনীর মধ্যে, সংশ্লিষ্ট থানার নাম দেখানো হল। ব্রাহ্মণবসান (দাসপুর), নয়াবসান, শ্রীধরবসান, সাঁতরাবসান, সারদাবসান (পাঁশকুড়া), নয়াবসান, ভগবানবসান (ডেবরা), নয়াবসান (খড়্গপুর), চাপবসান, নয়াবসান, পতুমবসান (তমলুক), পাণ্ডববসান (মহিষাদল), নয়াবসান (ভগবানপুর), কুশবসান, নয়াবসান (নারায়ণগড়), রামবসান (পটাশপুর), রানীবসান (কাঁথি)। এ-তালিকায় নয়াবসান ৬ বার উল্লিখিত হলেও ওই নামের প্রতিটি গ্রাম কিন্তু ভিন্ন অবস্থানের পৃথক লোকালয়। তর্কের খাতিরে যদি সেগুলিকে একই অভিধা ব'লে ধরা হয়, তা হলেও জেলার মোট ২১টি এ-শ্রেণীর পল্লী-নামের মধ্যে ১২টি উপরের নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত। বাকি ৪টি নাম অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী থানায় লভ্য। অতএব, আলোচ্য ছড়ার দাবিটি যথাযথ।

এবার 'দা'-অন্ত স্থান-নামগুলির পর্যালোচনা করা যাক। মেদিনীপুরে এই শ্রেণীর অভিধা যে সুপ্রচুর তা শুধু তমলুকের অদূরবর্তী থানাসমূহে অবস্থিত নীচের তালিকাভুক্ত গ্রাম-নামগুলি থেকেই সুপ্রমাণিত হবে। দূরবর্তী থানা-গুলিতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। যথা, খুকুরদা (দাসপুর), মেচেদা (পাঁশকুড়া), লোয়াদা (ডেবরা), মহিষদা (তমলুক), বাগদা (মহিষাদল), গোড়ামূলদা, ঘোলদা, বেনাওদা (ভগবানপুর), কোলানদা, ক্রোড়দা, বড়দা, মাকড়দা, শীতলদা (সবং), গগদা, নাহাকুরদা, বামনদা, সিংদা (পটাশপুর), এরেনদা, কউরদা, কুসুমদা, খাগদা, খেজুরদা, ডুবদা, ধূসরদা, বড়দা, বহরদা, বাড়িদা, ভাটদা, মলিদা (এগরা), কাপাসদা, কুমীরদা, নাচিনদা, বেলদা, মারিসদা (কাঁথি) প্রভৃতি। এ-তালিকায় 'দা'-অন্ত ৩৪টি নাম আছে ব'লে দৃষ্টান্তের সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। অতএব, আলোচ্য ছড়ার দুটি দাবিই যথার্থ।

হেঁয়ালিজাতীয় আর-একটি অনুরূপ ছড়া দেখা যায় কাশীরাম দাসের মহাভারতে—

"বার ঘাট, তের হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥"

মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানায় ইন্দ্রাণী নামের গ্রামটি এ-ছড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে না। এটির উদ্দিষ্ট বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে একই নামের প্রাচীন ও প্রখ্যাত এক লোকালয় যার নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায় 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯)। "কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ যে দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলিয়া স্থানের নাম ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী হয়। পূর্বে এখানে বারটি ঘাট ছিল এবং উহার প্রত্যেকটি তীর্থরূপে গণ্য হইত। কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে—

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যেথা বৈসে ভাগীরথী॥'

বর্তমানে ইন্দ্রাণী একটি পরগণার নাম।"

ভাগীরথীতীরে তীর্থতুল্য বারোটি ঘাটবিশিষ্ট এই ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে কাশীদাসী মহাভারতের অন্যত্র হেঁয়ালিজাতীয় যে-দ্বিপদীটি দেখা যায় তা এ-অনুচ্ছেদের প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে।

লক্ষণীয়, এখানে 'ঘাট,' 'হাট', 'চণ্ডী' ও 'ঈশ্বর' সেইসব অন্ত্য-পদযুক্ত স্থান-নাম সূচিত করে না, কতকগুলি বিশেষ ঘাট, হাট এবং দেবদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্রকে বোঝায়। (অতএব ছড়াটির বিশ্লেষণের মাপকাঠি এখানে ভিন্ন)। এ-অঞ্চলে ভাগীরথীর ঘন ঘন গতি-পরিবর্তনের ফলে সেগুলি এখন অনেকাংশে লুপ্ত। যেগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে, সে-সম্পর্কে পরিশ্রমী গবেষক তারাপদ সাঁতরা তাঁর 'ছড়া-প্রবাদে গ্রামবাংলার সমাজ' গ্রন্থে (কলকাতা: ১৩৮৮ সন: পৃ. ৩-৫) বলেছেন—

কালের প্রভাবে ইন্দ্রাণী জনপদ আজ বিস্মৃত। সরজমিন অনুসন্ধানে জানা যায়, সে গ্রামের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বারটি ঘাটের নাম ছিল—শাঁখারীর ঘাট, কদমতলার ঘাট, ইন্দ্রঘাট, বারদুয়ারীঘাট, কলুর ঘাট, স্বরূপ পালের ঘাট, গণেশ মাহাতার ঘাট, বক্সির ঘাট, ভাউসিংহের ঘাট, রাজার ঘাট, পীরের ঘাট ও দেওয়ান ঘাট। তের হাটের অবস্থান ছিল নদীতীরবর্তী কাটোয়া থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত। সেগুলির পর পর নাম—

গুড়েহাট, হাঁড়িহাট, আতুহাট, ঘোষহাট, বাজুপাতুহাট, পাতুহাট, খণ্ডলহাট, পাতাইহাট, চর পাতাইহাট, আকাইহাট, বিকেহাট, বীরহাট ও দণ্ডীহাট (অপভ্রংশে দাঁইহাট)। তিন চণ্ডীর হিসেব হল—একাইচণ্ডী, পাতাইচণ্ডী ও কুলাইচণ্ডী এবং তিনেশ্বর হল—ইন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর ও ঘোষেশ্বর। ভাগীরথীর ভাঙ্গাগড়ার ফলে এসব ঘাট ও হাটের অধিকাংশের আজ আর অস্তিত্ব নেই। তেমনি খুঁজে পাওয়া যাবে না তিন চণ্ডীর কুলাইচণ্ডী এবং তিন ঈশ্বরের চন্দ্রেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বরের অধিষ্ঠান-স্থল।

কাশীরাম দাসের জীবদ্দশার কাল আনুমানিক (খ্রীষ্টীয়) ১৭ শতকের প্রথম ভাগ। তাঁর রচিত আলোচ্য দ্বিপদীটি অতএব সাড়ে-তিন শ বছরেরও বেশী প্রাচীন। সেকালের প্রখ্যাত তীর্থ ও সমৃদ্ধ জনপদ ইন্দ্রাণীর অধিবাসীমাত্রেই যে স্থানীয় হাট-ঘাট বা দেবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন এমন আশা করা রচয়িতার পক্ষে অসঙ্গত হয়নি। সেজন্য এ-ছড়াটিও বাস্তবভিত্তিক।

স্থান-নামের সরল অর্থের পরিবর্তে দুরূহ প্রতিশব্দ ব্যবহার ক'রে অন্ত্য-মিলযুক্ত আর-এক প্রকার ছড়া দেখা যায় যেগুলিকে পুরাপুরি হেঁয়ালিজাতীয় বলাই সমীচীন। নীচের ছড়াটি তার অন্যতম নিদর্শন—

শ্রীমতীর পতি-পুরে করি আমি বাস।
ভূদেবদের পাড়া হতে অতি অল্প দূর।
গ্রামের নিকটে আছে নরবরপুর ॥

প্রশ্ন—আমার নিবাস কোথায়? 'শ্রীমতী' অর্থে রাধা, তাঁর 'পতি-পুর' রাধাকান্তপুর। 'ভূদেব' মানে যেহেতু ব্রাহ্মণ, সেজন্য 'ভূদেবদের পাড়া' ব্রাহ্মণপাড়ার সমার্থক। আর, 'নরবর' নরশ্রেষ্ঠ বা রাজাকে বোঝায় ব'লে 'নরবরপুর' হচ্ছে রাজাপুর। অতএব ধড়াচূড়া ছাড়িয়ে গ্রাম তিনটির বাস্তবিক নাম দাঁড়াল—রাধাকান্তপুর, ব্রাহ্মণপাড়া ও রাজাপুর। দেশ-বিভাগের পূর্বে এ-তিনটি সন্নিহিত পল্লী ছিল নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা-কেন্দ্র মেহেরপুরের কাছাকাছি অবস্থিত। এখন সব কয়টিই বাংলাদেশে। ভৌগোলিকভাবে, ব্রাহ্মণপাড়া রাধাকান্তপুরের অল্প দক্ষিণে এবং রাজাপুর সামান্য উত্তরে। অতএব, এই হেঁয়ালি-ছড়াটির উত্তর হল, ব্রাহ্মণপাড়া ও রাজাপুরের মধ্যবর্তী রাধাকান্তপুরে আমার বাস।

একদা এ-জাতীয় ছড়া নিশ্চয়ই অনেক লেখা হয়েছিল। লোকস্মৃতি থেকে লুপ্ত হবার আগে সেগুলিরও যথাসম্ভব উদ্ধার ও মুদ্রণ একান্ত কাম্য।